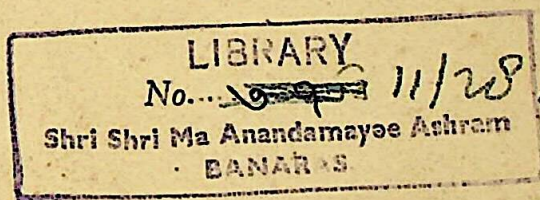


দেবজন্ম

PRESENTED

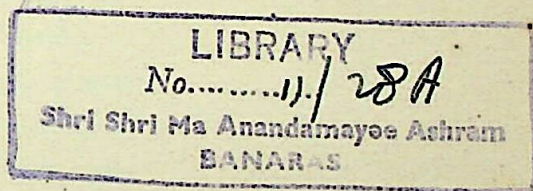


শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

11/28 A

দেবজন্ম

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত



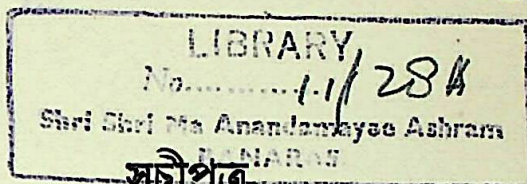
দি কালচার পাব্লিশাস
৬৩ কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা ১২

[লেখা কয়টি প্রথমতঃ প্রকাশিত হয় কয়েকখানি
সাময়িক পত্রিকায় ১৩২২ সাল হইতে ১৩৩৩ সালের মধ্যে।]

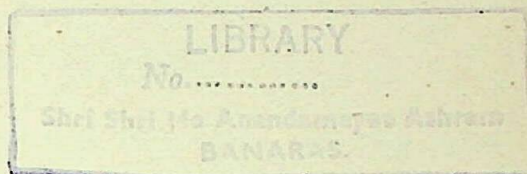
প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ, ১৩২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্জিত ও পরিবর্জিত) মাঘ, ১৩৫৮

প্রকাশক : শ্রীভারাপদ পাত্র,
দি কালচার পাবলিশার্স, ৬৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ;
মুদ্রাকর : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিতেরী

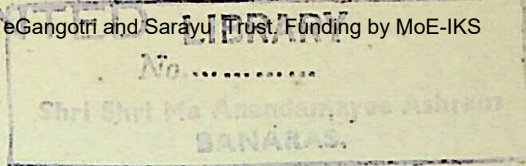
PRESENTED



১। দেবজন্ম	...	১
২। ধর্ম	...	৭
৩। ভোগঃ যোগায়তে	...	১২
৪। দুর্গমঃ পথস্তং	...	২০
৫। গুথ হুঃথ ও আনন্দ	...	২৬
৬। আত্মসমর্পণের কথা	...	৩৪
৭। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য	...	৪৪
৮। কর্ম ও যোগ	...	৫১
৯। জ্ঞান ও অজ্ঞান	...	৬৫
১০। ব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ	...	৭০
১১। ধর্ম্যং শরণং গচ্ছামি	...	৭৫
১২। সজ্বং শরণং গচ্ছামি	...	৮৩
১৩। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি	...	৯১
১৪। দেবজাতির কথা	...	১০০
১৫। মাহুয়ের ভগবান	...	১০৯
১৬। অবিদ্যা মৃত্যুং তীর্ষা	...	১১৫
১৭। স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ	...	১২২
৮। শ্রীঅরবিন্দের যোগ	...	১২৮



দেবজন্ম



দেবজন্ম

ইহলোকে এই স্থূল জগতেই আমরা রহিব। যাহা কিছু উপলব্ধি করিবার যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত করিবার তাহা জীবনেরই মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিব, জীবনেরই মধ্য প্রতিষ্ঠিত করিব, জীবনের অতীত হইয়া নয়। বৈদিক ঋষিগণ তাঁহাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত প্রয়াস উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন—দেবায় জন্মনে। এই দেবজন্ম লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য ; দেবতার সত্তা দিয়া আমাদের সত্তার প্রতি স্তর সত্ত্বপূর্ণ করিয়া গড়িব, দেবতার জীবন দিয়া জীবনের প্রতি অঙ্গ অমৃতময় করিয়া তুলিব।

ভগবানকে কে চায় না ? কিন্তু সকলে চায়, সেই ভগবানকে যিনি শুধু ভাবগত। অন্তরে একটা অনন্ত অনির্দেশ্যর বোধকেই সাধারণে ভগবৎ-উপলব্ধি বলিয়া জানে। সন্ন্যাসীর চক্ষে জীবন ও জগৎ যেন কেমন স্বপ্নবৎ। জরা মরণ, সুখ দুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান, শক্তি অশক্তি তাঁহার কাছে সকলই সমান, কাহারও বিশেষ কিছু মূল্য নাই তিনি শুধু দেখেন অথবা দেখিয়াও দেখেন না। তিনি মগ্ন এক সম-রসায়ক বিপুল বৈরাগ্যে। জগতের খেলায় তাঁহার উচ্চবাচ্য করিবার কিছুই নাই। যাহা আছে তাহাকেই ভগবানের পরমাস্তি অনিবর্বচনীয় লীলা বলিয়া স্বীকার করিয়া লন, তাহাতেই মুগ্ধ হৃদয়ে ভাসিয়া চলেন। কুয়াসাবৃত প্রকৃতির দৃশ্য নিকটে থাকিয়াও যেমন অস্পষ্ট দূরগন্ত, সাধুর চিন্তে এই জগৎও তেমনি সম্বন্ধহীন স্বদূর প্রবাসস্থলেরই মত।

আমরা কিন্তু ভগবানকে শুধু ভাবগত করিয়া রাখিতে চাহি না, আমরা তাঁহাকে বস্তুগত করিয়া তুলিব। জগতের খেলায় তাঁহাকে জাগ্রত মূর্ত্তিমান করিয়া ধরিব। ভগবান শুধু অনন্ত নহেন, তিনি সান্ত, তিনি শুধু অনির্দেশ্য নহেন, তিনি নির্দেশ্য, তিনি শুধু এক নহেন, তিনি বহু। তিনি চৈতন্যমাত্র নহেন, তিনিই শক্তি। তিনি শুধু শান্ত শিব নহেন, তিনিই আবার রুদ্ধ। নিখিল সৃষ্টির পশ্চাতে ভগবান শুধু নিখর সভামাত্র নহেন, তিনি প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে এক ঋতপূর্ণ প্রেরণারূপে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। ভগবান শুধু কবি নহেন, তিনি কন্ঠী, জগৎকে জীবকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে চালাইয়া লইয়াছেন, প্রতিমূহুর্ত্তে উহাদিগকে একটা বিশেষ কিছু করিয়া গড়িয়া উঠিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

আমাদিগকে একটা বিশেষ মূর্ত্তি লইয়াই গড়িয়া উঠিতে হইবে। ভগবান যে ভাবে চালান সেই ভাবে চলিয়া যাইব এইরূপ অন্ধ আলস্যপূর্ণ নির্ভরতাই সাধনার শেষ কথা নয়। ভগবানের হস্তে আমরা যন্ত্রণাত্মক, সত্য কথা। কিন্তু আমরা বুঝিয়া লইব ভগবানের কোন্ উদ্দেশ্যটি আমাদের মধ্য দিয়া ফলবান হইতে চাহিতেছে, কি উপায়ে এই উদ্দেশ্যটি সাধিত হইতেছে। জীবনের প্রতিমূহুর্ত্তে প্রতিক্ষেত্রে ভগবানের সেই বিশেষ ইচ্ছাটিকেই চিনিয়া লইব, স্থূলের মধ্যে তাহাকে শরীরী করিব। অস্পষ্ট ভাবকে জ্ঞানের দ্বারা চক্ষুস্থান করিতে হইবে, শক্তির দ্বারা উহাকে বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে। সাধারণ ভাবে কিছু পাওয়া বা হওয়া নয়, বিশেষভাবে কিছু পাওয়া বা হওয়াই সিদ্ধি।

মানুষের সাধারণ জীবন যেমন স্পষ্ট, জাগ্রত, লক্ষ্যযুক্ত, দৈনন্দিন কর্মময় জীবনকে মানুষ যেমন সংহত স্তবিন্যস্ত ফলপ্রসূ করিয়া এক সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছে, আমরাও আমাদের জীবনকে সেইরূপই করিব; তবে পূর্ণতর, দৃঢ়তর, শুদ্ধতর ভাবে। সাধারণ

মানুষ, তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের দৃষ্টি দিয়া, আমরা আনাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিব দেবতার দৃষ্টি দিয়া ।

* *

*

মনুষ্যজীবনের কেন্দ্র হইতেছে বুদ্ধি । বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ জীবনকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে । বিচারের দ্বারা সে স্থির করিয়াছে কি ভাল কি মন্দ, কি সম্ভব কি অসম্ভব এবং এই বিচারের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহার প্রেরণাকে চলিতে শিখাইয়াছে । তর্ক দ্বারাই সে সত্য নির্ণীত করিতে চাহিয়াছে । কিন্তু বিচার বিতর্কের দ্বারা সত্যের অংশবিশেষ আভাস বা ছায়া কিছু পাইলেও প্রকৃত সত্য বস্তু কখনও পাওয়া যায় না । বুদ্ধির সক্ষীর্ণ গোথুলি আলোকে আমরা পাই শুধু কি সম্ভব, কি হইলেও হইতে পারে । একটা সম্ভাবনীয়তাকে আশ্রয় করিয়া আমরা জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । তাই জগতে শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলাই বাহির হইয়া পড়িতেছে, সামঞ্জস্য ভেদ করিয়া দৃষ্টই ফুটিয়া উঠিতেছে । আমরা চাই সত্য । যাহা যথার্থ, বস্তুর মধ্যে যাহা অন্তরতম প্রকৃতি যে গুহ্যতম স্বর্ন সকল পরিণতির অন্তরালে, তাহার উপরেই আপনাকে, মনুষ্য-জাতিকে গড়িয়া তুলিব । একটা সম্ভাবনা মাত্রকেই ভর করিয়া জীবন কাটাইয়া দিব না ; ঋতকেই মর্ন্ত্যে বহন করিয়া আনিব । তাই নানাসিক প্রত্যয়ের পরিবর্তে চাই দিব্যদৃষ্টি । সঙ্গীত ঋগুতাকে, ইন্দ্রিয়-দত্ত পৃথককে অতিক্রম করিয়া আত্মায়, বৃহতে পৌঁছিতে চাই । বিচারকে পরিণত করিতে হইবে বিবেকে, বুদ্ধিকে পরিণত করিতে হইবে বোধি-রূপে । এই নবজন্মের আরম্ভে আমরা চাই কবিদৃষ্টি । এই কবি-দৃষ্টিকেই জীবনের কেন্দ্র করিতে হইবে । এই কবিদৃষ্টি দ্বারাই জীবনকে বৃহৎ পূর্ণ করিতে হইবে, জীবনে সে দৈবশৃঙ্খলা সামঞ্জস্য স্থাপিত করিতে হইবে । মানুষ কি জানে, কি বুঝে, মানুষের কি সুবিধা

দেবজন্ম

কি অসুবিধা তাহা দেখিব না। ভগবানের দৃষ্টি দিয়া দেখিব ভগবান কি চাহেন, ভগবানের জ্ঞান দিয়া জানিব তাঁহার উদ্দেশ্য কি, সত্যের যে ঋতময় প্রেরণা তাহার দ্বারাই জগৎকে নিম্নিত করিব।

সত্যদৃষ্টির জন্য, জ্ঞানের জন্য আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হইবেন সেই বৈদিক সূর্যদেব। আর মিত্রদেবকে আহ্বান করিব বিদ্বন্ধ প্রেমের জন্য। মানুষের হৃদয়রাজ্যে সুখদুঃখই যুগল সঙ্গী। প্রিয়বস্তুতে মানুষের বিপুল হর্ষ, অপ্রিয়ে ততোধিক বিষাদ। মিলন ও বিরহের আলোক আধারেই তাহার প্রেমের খেলা। আমরা কিন্তু প্রিয়কে অপ্রিয়কে সমানভাবে হৃদয়ে আনিদ্রন করিয়া নাই। শুধু তাহাই নহে, অপ্রিয় বলিয়া কিছু রাখিব না, অপ্রিয়কে প্রিয়ই করিয়া তুলিব। সুখদুঃখ অতিক্রম করিয়া আনন্দের শ্রোত ডাকিয়া আনিব। মিলন ও বিরহের স্বপ্নের মধ্যে নয়, একাত্মানুভূতির মধ্যে প্রেমকে সদাতুষ্টি রাখিব। আনন্দ হইতে আনন্দের মধ্যে দিয়া আনন্দেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিব। এ আনন্দে ক্ষর নাই, সীমা নাই, মলিনতা নাই—সদাই উজ্জ্বল, সদাই উচ্ছ্বসিত। ভূমানন্দ সাগরের ঢেউয়ের তালে তালে হৃদয়স্পন্দনকে উঠিতে পড়িতে শিখাইব। পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্য পদার্থই আমাদের জন্য আনন্দরস ক্ষরণ করিবে। কোথাও আমরা বিমুখ হইব না, কোথাও বীতশ্রদ্ধ হইব না, কোথাও স্বল্পভোগী হইব না।

বাসনা সকল দুঃখের মূল। বাসনাই ত আমাদের আশঙ্কিত শক্তিকে সামর্থ্যকে খর্ব করিয়া রাখে। কিন্তু বাসনার মধ্যে যে সত্য ইষণা আছে, ভগবানের যে ইচ্ছাটুকু কার্য্যকরী হইতে চাহিতেছে তাহাকেই শুদ্ধ করিয়া নাইব, সেই অনুসারেই চলিব। আমার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তিকে ভগবানের ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই ঢালিয়া দিব সেই ভগবৎ-শক্তিরই অবাধগতি মুক্ত করিয়া দিব। প্রাণের যে বিভিন্নমুখী

উন্নাগগানী অন্ধ চেষ্টারাজী, তাহাকে চিৎশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ পূর্ণ করিয়া সার্থক করিয়া নাইব। আমার ইচ্ছা, আমার প্রেরণা বলিয়া কিছু থাকিবে না ; ভগবানের অদম্য প্রেরণাই বীরজীবনের কর্ণ-পরিচালক হইবে। অগ্নিদেবের জ্ঞানদীপ্ত যে তপঃশক্তি হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, জগৎ প্রতিনিয়ত সৃষ্ট হইতেছে, সেই আদ্যাশক্তির আধার আমাদের কোন্ প্রয়াস বিফল হইবে, কোন্ লক্ষ্য অনভ্য রহিবে ?

সকল লীলার প্রতিষ্ঠাভূমি এই শরীরকে আমরা গঠন করিব সর্বস্বত্ত্ব দ্বারা। যে সংপদার্থ সমস্ত সৃষ্টিকে সংহত করিয়া রাখিয়াছে, যাহাকে লইয়া অস্তিত্ব, তাহারই দ্বারা এই স্থূলদেহ গঠিত, বিধৃত। রোগ দৌর্বল্য ; জরা মরণ অতিক্রম করিয়া এই ভগবৎসত্তার মধ্যে শরীরকে প্রতিষ্ঠিত করিব। দূর করিব সেই মায়ী, সেই অন্ধ সংস্কার—যাহার বশে শরীর আপনাকে দগ্ধবিশ্বংসী, রোগবীজপূর্ণ জড়মাত্র বলিয়া জানে। অমৃতত্বের দ্বারা শরীরকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে, কারণ অমৃতত্বই শরীরের আদি উপকরণ। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, বীৰ্য্য, শরীরকে ভরিয়া তুলিব। বিশ্বলীলার যে বিপুলতরঙ্গা গঙ্গা, তাহাকে ধারণ করিবে এই শরীর। এই শরীরকে ভিত্তিভূমি করিয়া দেবজন্মের সেই স্বর্গস্পর্শী সৌখ নিম্নিত করিতে হইবে।

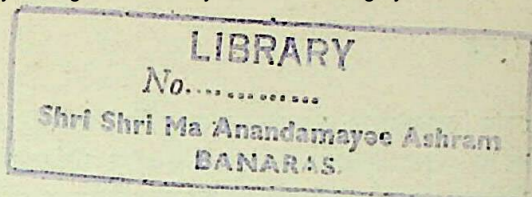
* *

*

মানুষের জীবন চারিটি লোকে বিভক্ত, চারিটি উপকরণে গঠিত। দেহ, প্রাণ, চিত্ত ও মন। মানুষ আছে, মানুষ কর্তৃক করে, মানুষ ভোগ করে আর মানুষ জানে—ইহাই মানুষের সবখানি। কিন্তু এই যে প্রতিষ্ঠান-চতুষ্টয় ইহা হইতেছে অপরা প্রকৃতি, মানব-প্রকৃতি। ইহা রূপমাত্র বহির্মুখমাত্র—পশ্চাতে, প্রত্যেকেরই অন্তরালে যে স্বরূপ রহিয়াছে তাহা লইয়াই পরা প্রকৃতি বা দেব প্রকৃতি। দেহ, প্রাণ, চিত্ত ও মনের

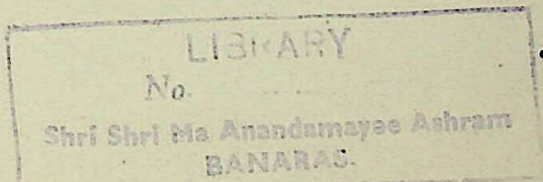
দেবজন্ম

উৎস স্থানে হইতেছে যথাক্রমে সৎ, চিৎ, আনন্দ, ও বিজ্ঞান। সৎএর ছায়া দেহ, চিৎএর ছায়া প্রাণ, আনন্দের ছায়া চিত্ত ও বিজ্ঞানের ছায়া মন। যাহাকে মানবপ্রকৃতি বা ইহলোক বলিয়া থাকি তাহা দেব-প্রকৃতি বা পরলোকেরই বিপরীত দিক—বিকার বা ঋণ নুত্তিমাত্র। আমাদের কর্তব্য শুধু বাহ্য কুটিল তাহাকে ধাঙ্গু করা যাহা বিকৃত তাহাকে স্বাভাবিক করা, বাহ্য ঋণ তাহাকে পূর্ণ করা। তাই অনুমানের পরিবর্তে চাই সাক্ষাৎ জ্ঞান, সুখের পরিবর্তে চাই আনন্দ, চেষ্টার পরিবর্তে চাই ভগবৎ-শক্তি আর নীলাক্ষেত্র স্বরূপ চাই অমৃতময় শরীর। ইহা লইয়াই দেবজন্ম, ইহা লইয়াই কৃতযুগের ধর্মরাজ্য।



ধর্ম

আমরা মানুষকে অনুসরণ করিতে বলি ধর্ম, জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহি ধর্মরাজ্য। কিন্তু এই ধর্মের অর্থ কি? হিন্দু যিনি তিনি তাঁহার শাস্ত্রবাক্য যথাযথ মানিয়া চলাই ধর্ম মনে করেন। অর্থাৎ নিত্য-কর্মপদ্ধতিতে যে বিধিনিষেধাদি লিপিবদ্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদনুসরণ করাই ধর্ম। ধার্মিক হইতেছেন তিনি যিনি সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিয়া থাকেন, নিয়মিত সময়ে ভগবানের নাম জপ করেন, পানে আহারে বিহারে সকল কর্মে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিছু করেন না, এক কথায় যিনি আচারসম্পন্ন। বর্তমানে আমরা অবশ্য ধর্ম কথাটিকে ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করিতে চাহিতেছি না, বাহিরের আচারের মধ্যে, বিশেষ জাতিগত কোন বিধিনিয়মের মধ্যেই উহাকে আর আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত নহি। ইহার একটা বিশ্বজাগতিক রূপই খুঁজিয়া লইতে প্রয়াসী হইয়াছি। ধর্ম অর্থে তাই আমরা কেহ বুঝিতেছি কতকগুলি নৈতিক গুণাবলী, যেমন অহিংসা অস্তেয় দয়া দাক্ষিণ্য ত্যাগ সংযম—যাহা সকল মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য, যে সকলের চর্চা করিয়া মানুষ একটা কিছু উন্নত জীব হইয়া উঠিতে পারে। ধার্মিক হইতেছেন তিনি যিনি সাধু। কর্মপ্রিয় রজঃ-প্রকৃতি ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া এই ভাবটিকেও কেহ আবার কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। ধর্ম হইতেছে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন। জীবনের যে নানা বিভাগ তাহার প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক কর্তব্য আছে। যে যে-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তাহার সেই বিভাগীয় কর্মগুলি



দেবজন্ম

কোন কিছু বাধা না মানিয়া অন্য কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া সম্পন্ন করিয়া যাওয়াই ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে ইহা নীতিশাস্ত্রের কথা, কিন্তু নীতিশাস্ত্র যখন পালন করি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, ভগবানেরই প্রীতির জন্য করিতেছি এই ধারণা হৃদয়ে গাঁথিয়া, তখন তাহা আর কেবল নীতি নহে তাহা ধর্মই।

কিন্তু আমরা নবীন যুগের সাধক আমরা যে ধর্মের প্রবর্তক হইতে চাহিতেছি তাহা এই সকল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। আচার ও নীতির যে আবশ্যকতাই থাকুক না কেন তাহা মানুষের একান্ত গভীরতম জিনিষটি নহে। আচার ও নীতি বাহিরের বস্তু, মানুষের উপর আরোপিত হইয়াছে মাত্র, তাহা তাহার নিজের ইচ্ছাতেই হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক। এ সকল মানুষ অনুসরণ করে জোর করিয়া, তাহার অন্তরতম অন্তরের সহিত ইহাদের সহজ নৈসর্গিক সম্বন্ধ নাই। প্রধানতঃ ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে সমাজকে সমষ্টিকে সংহত রাখিবার জন্য, সহজ সূচাকল্পপে পরিচালনা করিবার জন্য। আবার আচার ও নীতির সহিত যে ভগবানের নাম জুড়িয়া দিই তাহার যে কোন প্রকৃত সার্থকতা আছে তাহাও নহে। ভগবানের নাম না লইলে যেন নয় তাই নাম লই। অনেকে তাই ভগবানের স্থান খুঁজিয়া পায় না, আচার নীতিই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার কারণ ভগবানের উপর আমরা স্থান দিয়াছি মানুষ, মানুষের নিয়মাবলী। কাজেই এ দৃশ্য বিরল নহে যে যথার্থতঃ ভগবৎ-ভাবসিদ্ধ মহাপুরুষ এই নিয়মাবলীর মধ্যে আর আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, ভাগবত প্রেরণার মধ্যে আর মানবীয় বিধানের মধ্যে একটা একান্ত বৈপরীত্যই ফুটিয়া উঠিতেছে। সময়ে এই বাহিরের চাপ এত অতিন্মাত্র হইয়া উঠিয়াছে যে সাধারণ মানুষকেই দেখি মানুষের সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে, পূর্ণ স্বাভাব্য স্বৈচ্ছাচারকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে।

আমরা চাই সেই ধর্ম বাহার প্রতিষ্ঠা ভগবান, ভগবানের ইচ্ছা-শক্তি। সমাজ আমাকে বলিতেছে “শুধু তুমি, তোমার ধর্ম পরপদ-সেবা, ব্রহ্মজ্ঞানে তোমার অধিকার নাই,” দেশ বলিতেছে “দেশের সন্তান তুমি তোমার আর কোন কর্তব্য নাই, দেহ মন ধরিয়া দিবে দেশের কার্যে”। আমি কিন্তু এ সকল কিছুই গুণিব না, গুণিব আমার মধ্যে ভগবানের বাণী, আমার আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা আমাকে কোনদিকে চালাইয়া লয়। যদি আদেশ পাই “তোমার কোনই কর্তব্য নাই, যাও পর্বত-গহ্বরে সমাধিমগ্ন হও” তবে সকল কর্তব্য, সমাজের দেশের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাই করিতে হইবে। যদি আদেশ হয় দেশের জন্য দেশের জন্য সকল বুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড় তবে তদ্‌ব্যতিরেকে আমার অন্য গতি নাই। অন্তরে ভগবানকে জাগরিত করিয়া ধরা, তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে চলাই প্রকৃত ধর্ম। জীবনের, কর্মের, প্রয়াসের আর কোন মানদণ্ড নাই। আমার আত্মায় ভগবান কোন্‌ শক্তিরূপে আবির্ভূত তাহাই চিনিব তাহাকেই সর্বতোভাবে প্রকাশিত করিব তাহা আচার-বিরুদ্ধ নীতি-বিরুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু ভগবানের বিরুদ্ধ নহে। এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে মানুষের সমাজের নিয়ম মানুষকে যদি এই ভাবে পদদলিত করিয়াই চলিতে হয় তবে মানবজাতি মানব সমাজ টিকিবে কি করিয়া? নীতি ও আচার জগতের সাধনপদ্ধতিতে যে আদৌ স্থান পাইয়াছে তাহাতে কি বুঝিতে হইবে না উহা ভগবানের ইচ্ছা? ইহাই কি সত্য নয় সমাজের আচার নীতি ইহাতেছে ভগবানের সমষ্টিগত ইচ্ছা আর তোমার নিজের অন্তরের যে প্রেরণা বাহাকে ভাগবত প্রেরণা বলিতেছে—ভাগবত প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা ইহাতেছে ভগবানের ব্যক্তিগত ইচ্ছা? সমষ্টিগত যে ভাগবত ইচ্ছা তাহাই ত মহত্তর, ব্যক্তিগত ভাগবত ইচ্ছার উচিত তাহার

দেবজন্ম

অনুগত হইয়াই চলা। আমাদের উত্তর ব্যাষ্টির ও সমষ্টির যে দ্বন্দ্ব তাহা কেবল মানুষের মধ্যে, ভগবানের মধ্যে এইরূপ কোন দ্বন্দ্ব নাই থাকিতেও পারে না। এই দ্বন্দের উৎপত্তি হইয়াছে তখন যখন মানুষ মানুষের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছে, মানুষের যে অহঙ্কার-পরিচালিত অপরাধপ্রকৃতি তাহাকেই কেবল যখন মানুষ চিনিয়াছে। ভাগবত চৈতন্যে ব্যাষ্টি ও সমষ্টি পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিধৃত। ব্যাষ্টির যে সহজ প্রেরণা যে পূর্ণতা তাহার মধ্যে সমষ্টির প্রেরণা ও পূর্ণতাই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। ব্যাষ্টি হইতেছে বৃন্দের কেন্দ্র, সমষ্টি সেই একই বৃন্দের পরিধি। আচার ও নীতির যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা ভগবানেরই ইচ্ছা, কারণ যাহা কিছু আছে বা হয় তাহা আর কাহারও ইচ্ছা নয়। কিন্তু এই ইচ্ছা খেলিয়াছে মানুষের এপারের স্তরটি লইয়া—ইহার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ সন্ধানটি নাই।

সকল মানুষই যদি আপনার ভগবানকে চিনিতে পারে, আপন অন্তরাস্ত্রার প্রেরণার ইসারায় চলিতে পারে, তবে কোথাও কোন দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ফুটিয়া উঠিবে না। সমাজ মানবজাতি চলিবে বিধাতার পরম-সমন্বয়বিধৃত বিধানের মধ্য দিয়া। সকল মানুষ যদি নিজ নিজ অন্তরের ভাগবত আদেশ পালন করিয়া চলে তবে ভগবানের বিশ্বজাগতিক সমষ্টিগত যে বিচিত্র লীলা তাহাও চনিবে অপূর্ব সামঞ্জস্য-মণ্ডিত হইয়া। মানুষের বিধান কখনই জগৎকে তেমন সুচারুরূপে অব্যর্থ ফলপ্রসূ করিয়া পরিচালিত করিতে পারিবে না। বিধান যখন শুধু পুস্তক-নিবদ্ধ নহে, তাহাকে কার্য্যকরী করিতে যখন আইন আদালত সমাজের শাসন প্রয়োজন হয় না তখন মানুষ নিজেই নিজের ধর্মপালক এবং সেইজন্য সকলের সমগ্রেরই ধর্মপালক।

এই ধর্ম কেহ স্বজন করিতে পারে না। যে নিগূঢ় প্রেরণায় এক বছরপে বিচ্যুরিত হইয়া পড়িয়াছে, বাহার শাসনে নিখিল সৃষ্টি

চলিয়াছে, যাহা শাস্ত্রত সনাতন তাহাই ধর্ম। ইহার প্রতিষ্ঠা তুরীয়-লোকে, ভগবানের বিজ্ঞানলোকে বিরাট চৈতন্য-মধ্যে। ইহারই নাম সত্যলোক—যেখানে সত্য সত্তা, সত্য কর্ম সকল বস্তুর অন্তরায়ের প্রকৃতি। বাহিরে স্থুলে অথবা মন বুদ্ধির মধ্যে যে বিধান যে শৃঙ্খলা তাহা এই গভীরতর উচ্চতর বিধান ও শৃঙ্খলার বিকৃতি বা ছায়া মাত্র। এই যে সত্য বিধান এই যে সত্য শৃঙ্খলা মানুষ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পারে ইহার রূপ, দিব্যশ্রুতিতে শুনিতে পারে ইহার নাম। ঋষিদিগের আখ্যা তাই দ্রষ্টা শ্রোতা। কিন্তু কোন্ মর্ত্যজীব এই সনাতন ধর্মকে জন্ম দিতে অথবা রচনা করিতে সাহসী হইবে? মানুষের সকল কর্তব্য তাহার অধঃস্তরের প্রকৃতিটি উপরে উঠাইয়া এই সমুদেচর মধ্যে সংগ্রথিত করিয়া দেওয়া, অত্রের যে ব্যর্থ শৃঙ্খলা প্রয়াস তাহার পরিবর্তে অমৃতের অব্যর্থ অদ্বন্দ্ব সামঞ্জস্যকেই প্রকটিত করিয়া ধরা। মন বুদ্ধি আবেগ বাসনা যে ধর্ম রচনা করে সে ধর্ম খণ্ডিত ধর্ম, যেন গোখুলির অস্পষ্ট ছায়াপাত। আমরা চাই অন্তরের চৈতন্য, বৃহত্তর মধ্যাহ্ন মার্ভণ্ডে আয়ার যে অঙ্গ সঞ্চালন রেখায় রেখায় স্ফুট, স্ফুরিত, পরিপূর্ণ।

ভোগঃ যোগায়তে

সচরাচর যোগ অর্থে আমরা বুঝি চিত্তবৃত্তি নিরোধ। অর্থাৎ অন্তঃকরণের খেলা যখন আমার সব স্তব্ধ হইবে, মনে যখন কোন চিন্তা নাই, হৃদয়ের যখন ভাবোচ্ছ্বাস নাই, প্রাণে কর্মেষণা নাই, সব যখন শান্ত তখনই আমার যোগাবস্থা। এ জন্য যোগীর সর্বপ্রথমে প্রয়োজন নির্জন স্থানে স্থিরসুখাসনে উপবেশনপূর্বক নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকা। দেহে মনে সর্বতোভাবে নিবাত নিকম্প প্রদীপবৎ স্থির হওয়াই যোগীর যোগ। কারণ অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ যখন বিশুদ্ধ তখনই সেই বিকোভহীন নির্মল শান্তি ভেদিয়া ফুটিয়া উঠে জীবের স্বরূপ, তাহার গভীর অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মসত্তা। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্।

এই সিদ্ধান্তে একটি কথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে দেহ প্রাণ চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার ইহারা ইহাদের অধিষ্ঠাতৃপুরুষকে শুধু আবৃত করিয়া রহিয়াছে। আবেশ ও আধার, কর্তা ও করণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা হৃদয়ের, বিরোধের সম্বন্ধ মাত্র। কিন্তু একথাটি কতদূর সত্য? ভাস্কর যখন প্রস্তর কাটিয়া মূর্তি গঠনে নিযুক্ত, তখন তিনি কেবল অবাধ্য উপকরণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন কি? কবি যখন শব্দ বোজনা করিয়া কাব্য রচনা করিতেছেন তিনি সর্বদা জোরজবরদস্তি করিয়া বিদ্রোহীকে আপন করায়ত্ত করিতে চাহিতেছেন? ইহাই বরং গভীরতর সত্য যে শিল্পী স্থূল উপকরণরাজিকে তাঁহার ভাব প্রকাশের সহায় বলিয়াই

বোধ করেন উভয়ের মধ্যে একটা সহজ সামঞ্জস্যই তাঁহার সৃষ্টির মূল প্রেরণা। আপাতদৃষ্টিতে বস্তু বতই কঠিন; নিরেট, অনমনীয় জড়মাত্র বলিয়া বোধ হউক না, শিল্পী তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার সাহায্যেই অস্তরের সুক্ষ্ম তরলিত ভাবরাশি প্রকাশিত করিয়া থাকেন। বস্তু ভাব প্রকাশের বাঁধ নয় সেই ভাব প্রবাহেরই উদার বিস্তৃত স্বাভাবিক প্রণালী।

যোগীর সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সাধারণতঃ মানুষের বৃত্তিসমুদয় তাহার আধ্যাত্মিক গভ্রা প্রকাশের পরিপন্থী। ইন্দ্রিয়ের গতি বহির্-মুখী, স্থলের, বৈচিত্র্যের, বিক্ষোভের দিকেই উহা ছুটিয়া চলে। এই ইন্দ্রিয়ের শ্রোতে ভাসিয়া চলিয়া জীবও তাই সহজেই আপনাতাহার, সীমাবদ্ধ, বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল, স্থূলপ্রত্যয়সার হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের খেলা আত্মবোধের প্রতিবন্ধক সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই আবার সবখানি সত্য নয়। একদিক দিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন সৃষ্টি প্রকৃতি ইন্দ্রিয়, শ্রষ্টাকে পুরুষকে আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, জগৎ যেন ব্রহ্মকে অস্বীকারই করিতেছে। ইহা সাধকের প্রথম অবস্থার কথা। সাধক যখন ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী শ্রোতে উজ্জান কাটিয়া তাহার উৎসস্থানে পঁহুঁছিতে চাহিতেছেন, জড়ের বশীভূত মানুষ মুমুক্ষু হইয়া যখন 'নেতি' 'নেতি' করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। কিন্তু মুমুক্ষু যখন মুক্ত, যখন সেই পরমে সেই সমুচ্চ সে আকৃষ্ট তখন সে দেখে যে-সমস্ত সে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহা একান্ত পরিত্যাগ করিবার নয়, তাহা সেই পরমেরই ছায়া, বিকাশ, সেই পরমই—তখন সে আবার 'ইতি' 'ইতি' করিয়া নামিতে পারে। তখন সে দেখে সৃষ্টির মধ্যেই শ্রষ্টা, সৃষ্টিই শ্রষ্টা, প্রকৃতির মধ্যেই পুরুষ, প্রকৃতিই পুরুষ, দেহের মধ্যে আত্মা, দেহই আত্মা। আধার তখন আশ্রয়ের পরিস্ফুটী, তাহার জ্যোতির্ময় কিরণরাজি, ঘনকৃষ্ণ অবগুঠন মাত্র নয়।

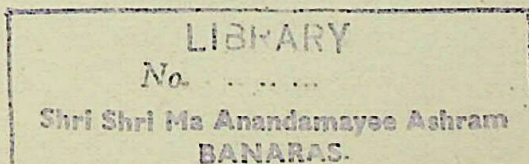
দেবজন্ম

বস্তুতঃ এইটিই প্রকৃত সত্য। ইন্দ্রিয়সমষ্টি শূন্য হইতে উদ্ভূত হইয়া আত্মার মুখে যবনিকা-রূপে ছাইয়া বসে নাই। ইন্দ্রিয়াদি নহীয়া যাহা আধার তাহা আত্মা হইতেই আগিয়াছে, উভয়ের মধ্যে ছেদ নাই, একটা সহজ গভীর জীবন্ত সংযোগই রহিয়াছে। অপক্ক অবস্থার প্রাকৃতজন্মের বৃত্তিবিক্ষোভের মধ্যেও অতিপ্রাকৃতের ক্ষমতাস্রোতঃ গিত্য বহনান। যাহা কিছু আছে তাহার কোনটিই একেবারে অন্ততম নয়, প্রত্যেকের মধ্যে, আপাততঃ তাহাকে যতই অসত্য, অকল্যাণকর মনে হউক না, একটা গভীর সত্য, উদার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। এই কথা লক্ষ্য করিয়াই বেদ দেবশত্রু দম্ভ্যপণিদিগের প্রকৃতি চিত্রিত করিয়াছেন। পণিগণ অজ্ঞানতার শক্তি—কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা একেবারে অজ্ঞানময় নহে। জ্ঞানজ্যোতিঃ অপহরণ করিয়া আপন গুহা গহ্বরে লুকাইয়া রাখে নাত্র। দেবতার কার্য্য সেই গুহা ভেদ করিয়া সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ উদ্ধার করা। পণির তনসাবৃত কঠিন আবরণের অন্তরেই জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত রহিয়াছে, শুধু সেই আবরণ বিদীর্ণ করিয়া জ্যোতিঃকে নিঃসৃত্ত করিয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে—আর্য্য-যোদ্ধার ইহা জীবনব্রত। সেইরূপ সকল অজ্ঞানতা সকল অসত্যতার মধ্যেই রহিয়াছে জ্ঞানের, সত্যের রেখা। ইন্দ্রিয়ের খেলা শুধু ভ্রম, শুধু মরীচিকা, নিঃশেষরূপে পরিত্যজ্য নহে। মায়া যাহাকে বলি তাহা নিতান্তই মায়া নহে। ঋষিদিগের ভাষায় মায়া দুই প্রকার—‘দেবী মায়া’ আর ‘অদেবী মায়া’। অদেবী মায়া হইতেছে তাহাই যাহার প্রভাবে জীবের অন্তরে অজ্ঞানতা, অশক্তি অথবা ভুলজ্ঞান অশুদ্ধ-শক্তি প্রভৃতি আগিয়া অধিকার করে, যাহার ছায়া পড়িলে বস্তু কুরূপ হইয়া উঠে। বৃত্তের তাই নাসিকা নাই, হস্ত পদ নাই। বৃত্তের ‘অদেবী মায়া’কে জ্ঞানোন্মিগ্ন মনের দেবতা ইন্দ্র বিদুরিত করেন তাহার দৈবী মায়ার সাহায্যে। দৈবী মায়া হইতেছে জ্ঞানময় সত্যময়,

যাহা নইয়া বস্তু স্বন্দর স্বরূপ। নায়া কাটিয়া উঠিতে হইবে কিন্তু সেই নায়া যাহা অসরল কুটিল সঙ্কুচিত, যাহা জ্ঞান আনন্দ শক্তির বিকৃত নুষ্টিমাত্র। রাখিতে হইবে সেই নায়া যাহা দেবতার দান, যাহা ভগবানের স্রষ্টান সুবলয়িত প্রকাশ। সৃষ্টির নায়ায় অতীত হইবার প্রয়োজন নাই, শুধু কুসৃষ্টি যাহা কু-নায়া যাহা তাহাকে পরিবর্তিত করিয়া তাহার মধ্য হইতেই ঋতময় সৃষ্টি, সত্যরচিত নায়াকে ধীরে ধীরে বাহিরে পূর্ণ প্রকটিত করিয়া ধরিতে হইবে।

ইহাই যদি সত্য তবে কোনরূপ বিরোধ বা নিগ্রহকে আমাদের যোগসাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সৃষ্টিকে কংকার দিয়া যাহারা চলিয়া যাইতে চাহে নিগ্রহ তাহাদেরই পন্থা। কিন্তু আমরা সৃষ্টিকে ভগবানেরই আশ্রয় বিকীরণ বলিয়া জ্ঞানি তাই সৃষ্টিকে ধরিয়াই আমরা চলিব। বৃত্তির নিরোধ নয় তাহার সকল রকম পরিস্ফুরণের মধ্য দিয়াই আমাদের যোগসাধন। কারণ যোগ অর্থে আমরা বুঝি না মানুষ হইতে, মানুষের বর্তমান স্বভাব বা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা রহস্যময় কিছু কোথাও হইতে আনিয়া মানুষের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে, অলক্ষিত, অতীন্দ্রিয় কিছুই দুর্বিসয় গুরুভারে মানুষের বর্তমানকে পিষ্ট করিয়া, তাহাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। আছে যাহা—তাহার সবখানি নইয়াই প্রতিষ্ঠা ও আরম্ভ। কি হইতে হইবে তাহার ইঙ্গিত সব এইখানেই। বর্তমানের, আছের খেলাকে বন্ধ করিয়া দিলে ভবিষ্যতের দিকে ভগবানের সেই সহজ ইঙ্গিতকেই আমরা হারািব।

গীতার “যোগঃ কৰ্মসু কৌশলঃ” আমাদের বক্তব্যটিকেই প্রমাণিত করিতেছে। কৰ্ম রাখিতে হইবে, কৰ্ম ত্যাগ করিয়া কোন ফল নাই। প্রকৃতির সকল প্রেরণার মধ্যই জাগ্রত থাকিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতির বাতাসমূল জীবনসমুদ্রে হৃদয় নাবিকের মত চলিতে হইবে।



দেবজন্ম

বিক্রমের মধ্যে সত্যাকর্ষ চিনিয়া লইয়া সত্যাকর্ষী হইতে হইবে, কুটিল প্রেরণারই অঙ্গুলি নির্দেশে চলিয়া ঋতময় প্রেরণা বাহির করিতে হইবে, অসত্যকে, অজ্ঞানকে, কুটিলকেই সত্যো, জ্ঞানে, ঋজুতার গড়িয়া তুলিতে হইবে। কর্ণে এই কোশলই সকল যোগ। দুগ্ধ ত সর্বদাই জলের সহিত মিশ্রিত, হংস কিন্তু জলটুকু পরিত্যাগ করিয়া শুধু দুগ্ধ আহরণ করে।

সন্যাসীর যোগে নিরোধ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে আবশ্যিক ইহা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে কর্ণযোগীর পক্ষেও ইহার যে প্রয়োজন নাই এক্রপ নহে। সাধন অবস্থার নিরোধের প্রয়োজন, কেবল সিদ্ধ হইলেই উহার প্রয়োজন নাই। কর্ণযোগীও তাই প্রথমে বৈরাগ্য দ্বারা, নিবৃত্তি দ্বারা প্রকৃতির অশুদ্ধ খেলা হইতে মুক্ত হইবেন, মুক্ত হইবার পর শুদ্ধ প্রেরণা লইয়া তিনি কর্ণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। ইহাই সহজ পন্থা—অন্যটি বিপদগঙ্গুল। প্রবৃত্তির খেলার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া তাহার মধ্যেই অশুদ্ধ হইতে শুদ্ধ, প্রাকৃত হইতে দৈব খুঁজিয়া লওয়া ও অশুদ্ধকে প্রাকৃতকে বর্জন করিয়া শুদ্ধে দৈবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন, এমন কি আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ। পিপাসিতের পক্ষে কর্দমাক্ত জল হইতে কর্দম বর্জন করিয়া শুদ্ধ জল পান করা কতদূর সম্ভব? প্রবৃত্তিতাড়িত অসহায় প্রাকৃত জন কি এই পিপাসিতেরই তুল্য নয়?

উত্তরে প্রথমে আমরা বলিব এতটুকু বাহার সাহস নাই যোগে তাহার অধিকার হয় নাই। পাপের ভয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া যে কার্পণ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগে দীক্ষিত করিবার পূর্বে সর্বাত্মে সেই মহাদোষটি দূর করিতে বলিয়াছেন। নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, ততোধিক ভগবানের শক্তিতে, তাঁহার নেতৃত্বে শ্রদ্ধা—ইহা হইতে যোগের আরম্ভ। কর্ণযোগী সকল কর্ণে লিপ্ত হইয়া সকল কর্ণ ভগবানে অর্পণ করিয়া

সর্বদা মনে রাখিবেন ভগবানের আশ্বাস বাক্য, “অহং ভ্যাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ”। সন্ন্যাসী যোগ করেন নিজের জন্য, শুধু আপনার শক্তিবলে, তাই প্রতিপদে তাঁহার আশঙ্কা—পাছে শক্তিতে না কুলার, পাছে মুক্তির ব্যাঘাত হয়। আমাদের সে আশঙ্কা সে সন্দেহ নাই। কারণ ভগবানে সর্বস্ব আমরা দিয়াছি, তিনিই আমাদের মধ্যে সাধক, ফলাফল তাঁহারই। তাই আমাদের সাহসের সীমা নাই, শক্তির পরিধি নাই। প্রবৃত্তির তরঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া সন্তরণ করিতে কোনই ইতস্ততঃ নাই। বস্তুতঃ কঠিন বলিয়া কোন কার্য্য হইতে যে ফিরিয়া চলিয়া আইসে তাহার কোন সহজ কর্ণই ভুটে না। জগৎকে ‘কঠিন ঠাঁই’ বলিয়া যে সন্ন্যাসী হয় তাহার সন্ন্যাসেও সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহ।

প্রবৃত্তির খেলা কেন রাখিতে চাই সে সহজে পূর্ব্বই যাহা বলিয়াছি তাহা ছাড়া আরও বলিবার আছে। জগৎ ত্যাগ করিয়া, সকল প্রেরণা দমন করিয়া নিরল শান্তিতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। সে মুক্তি লাভ করিয়া কর্ণের জন্য জগতে আবার ফিরিয়া আসিতে পারি। কিন্তু এই কর্ণ যে মুক্তির কর্ণ, ভাগবত প্রেরণার কর্ণ তাহার নিশ্চয়তা আছে কি? অন্তরে আমি মুক্ত হইরাছি, পুরুষকে নিলিখ্ত করিয়া পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি কিন্তু আধারকে প্রকৃতিকে ত মুক্ত করি নাই। প্রকৃতির বাহিরে আমি মুক্ত কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতির ভিতরেও কি মুক্ত হইব? প্রকৃতির সহিত যতক্ষণ নিঃসঙ্গ ততক্ষণই আমি শুদ্ধ মুক্ত কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে আসিলে প্রকৃতি তাহার পূর্ব্ব সংস্কারবশে তাহার গতানুগতিক ধর্ম্মকেই অনুসরণ করিয়া চলিবে। আমাদের উদ্দেশ্য প্রাজ্ঞানক্ষম মাত্র নহে—প্রাজ্ঞনের মধ্যে সনাতন সমুচ্চ বর্গ যে তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল খেলা, ক্ষয় নহে বিকাশই আমরা চাই। আধারের মুক্তি আধারের মধ্যে থাকিয়াই সম্ভব, আধারের অতীত হইয়া নয়। প্রতি

দেবজন্ম

কর্মে, প্রতি প্রেরণায়, প্রতি চালনার সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই প্রকৃতিকে সংশোধিত, পরিমার্জিত, পরিস্ফুট, শুদ্ধ মুক্ত পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাধুর মধ্যে যে মুক্তি তাহারই জোরে সচলের মধ্যেও যে মুক্তি পাইব, সচলকেও মুক্ত করিব ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। পক্ষি জলকে নির্বল জন করা যায়, কিন্তু শূন্যতাকে কি করিয়া জলে পরিণত করিব? প্রাকৃত প্রেরণাকে ভাগবত প্রেরণায় পরিণত করা সহজ, কিন্তু প্রেরণার অবগান কি করিয়া প্রেরণার জন্ম দিবে? দেহাতিরিক্ত মুক্তি দেহকে কি করিয়া মুক্ত করিবে?

তারপর আমাদের যোগের উদ্দেশ্য প্রেরণার বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য। এই বৈচিত্র্য, এই ঐশ্বর্য কৃষ্টিয়া উঠে খেলারই মধ্য দিয়া, সঞ্চালনার মধ্য দিয়া, প্রকৃতিকে তাহার সহজ গতি প্রবাহে ছাড়িয়া দিয়া। নিরোধের দ্বারা বৃত্তিসকল স্বভাবতঃই ক্ষীণ পদু হইয়া পড়ে, তাহাদের শতধারা উৎস শুকাইয়া যায়, প্রতিভার নবনবোন্মেষ আর হয় না। বৃত্তির নিত্য নবোন্মেষ স্বতঃই চলিয়াছে অস্বার্থ্যাগী ভগবানের ইচ্ছায়, তাহারই বিভূতি জাগ্রতে প্রতিষ্ঠিত করা উহার লক্ষ্য। কৈবল্যমুক্তি-প্রয়াসীর কাছে এ সকলের কোন মূল্য নাই কারণ তিনি চাহেন শুধু এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ভিন্ন, তাহার পথে চলা আমাদের পক্ষে মহা ভুল।

অত্র যাহা, তাহা অমূত্রেরই প্রতিনিধি। এখানে যাহা আছে তাহা সেখানেও আছে, এখানে যাহা নাই তাহা সেখানেও নাই কোথাও নাই। যদিহাস্তি তদন্যত্র ষ্ণোহাস্তি ন তৎ কচিৎ। আমাদের যোগের ইহাই মূলতত্ত্ব। এখানে যাহার প্রকাশ তাহাকে অস্বীকার বা নিগ্রহ করিয়া নয়, তাহাকে স্বীকার করিয়া, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া, তাহার সাহায্যেই অন্যত্রকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যে বৃত্তি, যে প্রেরণাই আগার খাকুক না তাহা শূন্যে ঝুলিয়া নাই, তাহার

ভোগঃ যোগায়তে

মূল সত্যলোকে, ভগবানের মধ্যে, তাহার প্রত্যেকটিরই ভাগবত অর্থ, সার্বিকতা, পরিপূর্ণতা রহিয়াছে। সৃষ্ট ভগবানের অভাবান্বিত রূপ নহে, উহার মধ্যে তিনি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, উহারই মধ্য দিয়া তিনি বিকাশে বিকাশে নিজের কাছে নিজে গোচরীভূত হইয়া চলিতেছেন। তাই তত্ত্বের বীরসাধকের মত আমরা জ্ঞানি ভোগই যোগস্বরূপ, সংসারই মোক্ষস্বরূপ—

ভোগো যোগায়তে সন্যাসং দুঃখং স্বকৃতায়তে।

মোক্ষায়তে চ সংসারঃ.....॥

দুর্গমঃ পথস্ত৭

আমরা যে ভাবের সাধক, যে আদর্শটি জগতে কার্য্যতঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছি তাহা যে কত বৃহৎ, কত কষ্টসাপেক্ষ তাহা একবার চিন্তা করা প্রয়োজন। আমরা চাই কি? আমরা চাই স্থূল শরীরে দেবত্বলাভ, মরজগতের মধ্যে মরজগতের সহারে অমৃতত্বের খেলা। আদর্শটি কি অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয় না? মনুষ্যজাতির মধ্যে কয়জন আছে যাহারা এই আদর্শ সন্মুখে রাখিতে ভীত হইয়া পড়ে না, কয়জনই বা আছে যাহারা ইহাকে উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবে না? আর আমরা যে দুই চারিজন এই আদর্শকে জড়াইয়া ধরিয়াছি অথবা যাহা-দিগকে এই আদর্শ জড়াইয়া ধরিয়াছে, আমরাই কি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি আমাদের লক্ষ্য কত দূরপ্রসারী, আমাদের আকাঙ্ক্ষা কতখানি প্রয়াস, কতখানি শক্তি, কতখানি সামর্থ্যের অপেক্ষা রাখে? আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, উচ্ছ্বাস সাধকের প্রথম অবস্থায় উপকারী ও প্রয়োজনীয় কিন্তু কেবল ইহাদের সাহায্যেই অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। পথের সমস্ত বিপদ, সমস্ত বিভীষিকা, যে উদ্ভুদ্ধ পর্বত অথবা গহন গভীর গহ্বর প্রতিপদে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হইবে তাহার একটা সম্পূর্ণ হিসাব না রাখা নিব্বুদ্ধিতার কার্য্য। প্রত্যেক বাধাটির সহিত পরিচিত হইয়া তাহার শক্তির পরিমাপ করিয়া এমন কি তাহার সার্থকতাটুকু বুঝিয়া তবে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিতে হইবে। নতুবা

অন্ধ-দৃষ্টিভরে, শুধু কল্পনার মরীচিকায় উৎকল হইয়া চলিলে প্রধান বাহার সহিত সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবার আশঙ্কাই অধিক।

আমাদের বিরুদ্ধে নাই কি ? দেশ কাল পাত্র সমস্তই আমাদের বিরুদ্ধে। সমস্ত পৃথিবী জয় করা আমাদের লক্ষ্য কিন্তু পৃথিবীর কতটুকু অংশ লইয়া আমাদের এখন অধিষ্ঠান, কর্ত্ত্বক্ষেত্রের কতটুকু আমাদের এ ভাব মানিয়া চলে ? পৃথিবীর পরমাণুসদৃশ কোণটিও অধিকার করিয়া রহিয়াছি কি ? তারপর কাল—সহস্র সহস্র বৎসরের গতিবেগ রহিয়াছে আমাদের বর্ত্তমানের পশ্চাতে, আমরা এই যুগরাশির বর্ধ পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছি। কোন্ যুগে মর্ত্ত্য ছিল দেবলীলার ক্ষেত্র, আদৌ ছিল কি ? কালের এই যে দুর্দ্ধর্ষ নায়ত্রা-প্রপাত, তাহাকে রুদ্ধ করিয়া ধরিতে হইবে, শুধু তাহাই নয়, উহাকে আবার উদ্ধ মুখী করিয়া চালানিয়া লইতে হইবে। এ কোন দুঃসাহস ! আর আমাদের বিরুদ্ধে রহিয়াছি আমরা নিজেরা, আমাদের নিজের প্রকৃতি, মানুষের স্বভাব। পরাধীন-খানি—মানুষের ইঞ্জিরগ্রাম স্বভাবতঃই বহির্মুখী, তাহার বৃত্তি ক্রমনিম্ন প্রসারী। ধুলির প্রতি তাহার কি তীব্র আকর্ষণ, জরা মৃত্যু, অজ্ঞান, অশক্তি, ঋণতা অপূর্ণতার দিকেই তাহার সহজ গতি। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাকে পরাস্ত করিতে হইবে, তাহাকে আজ্ঞানুযায়ী করিতে হইবে—সে ক্ষমতা সে বীর্য্য কাহার সম্ভব ?

কারণ এইটি ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন—দেবজন্ম লাভ অর্থাৎ মানুষ বলিতে এখন বাহা বুঝি, তাহার প্রকৃতি, তাহার স্বভাব, তাহার বর্ধ, তাহার গুণ, তাহার কর্ত্ত্ব, বাহা আজ কাল নয়, বাহা দেখা যায় যেন অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান, সে সমস্ত উল্টাইয়া দিতে হইবে, আর শুধু তোনার আমার মৰ্য্যে নহে, কিন্তু বিশৃঙ্খলবজ্রাতির মৰ্য্যেই। ইহার অর্থ কত পরিশ্রম, কত তপস্যা তাহার অবধি আছে কি ? কত সময়ই বা তজ্জন্য প্রয়োজন ? আজ আমি বাহা হইয়াছি তাহা গড়িয়া তুলিতে

দেবজন্ম

আমার কত বুগ লাগিয়াছে, তাহা কি কুৎকারেই ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, না মস্ত পড়িয়া নিমেষের মধ্যে পুনর্ব্বার গড়িয়া তুলি যায়। মনকে, প্রাণকে, চিত্তকে, শরীরকে তিল তিল করিয়া গাঁথিয়া তুলিয়াছি, ভাঙ্গিতেও হইবে তিল তিল করিয়া, আবার সৃজন করিতে হইবে তিল তিল করিয়া। মানুষ শিশুর ক্রীড়নক নহে যে এক আঘাতেই চূর্ণ হইয়া যাইবে। মানুষ হইতেছে মহাকায় হিমালয়—ইহাতে কত অল্পভেদী শৃঙ্গ, কত গহন অরণ্যানী, কত বিকট তুমারপ্রপাত, কত দুর্ব্বার নদীপ্রবাহ, ইহাতে কত জীব কত জন্তু, ইহাতে কত অজ্ঞাত বিভীষিকা। এই হিমালয় কাটিয়া তাজমহল প্রতিষ্ঠা করিবে কোন্ অক্লান্তকর্ম্মী, কোন্ উন্নত শিল্পী?

সাধারণ মানুষ এই আদর্শ দেখিয়া যে ভয় পাইবে বা উপহাস করিবে তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। আর কেহ বা যে অন্য আদর্শ অন্য পন্থা খুঁজিবে তাহাও অস্বাভাবিক নহে। ইহাবাদী তাই প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না, কোনরূপে কলে কৌশলে প্রকৃতিকে প্রতারিত করিয়া অথবা তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কিছু আদার করিতে পারিলেই সে সন্তুষ্ট। আর নাস্তাবাদী, তিনিও প্রকৃতিকে জয় করিতে চাহেন না, প্রকৃতিকে তিনি অজের বলিয়া জানেন, প্রকৃতিকে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া প্রকৃতির অতীত হইয়া তিনি চলিয়া বাইতে চাহেন।

আমরা যাহারা চাহিতেছি প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতিকে জয় করা ও প্রকৃতিরই মধ্যে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আমাদের এই সকল উদাহরণ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ অতি ভীষণ ব্যাপার। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ দেখিয়াই আমরা শিহরিয়া উঠি। কিন্তু আধ্যাত্মিক যুদ্ধের তুলনায় এই স্থূল রক্তমাংসের যুদ্ধ কি? প্রকৃতিকে প্রতি সূচ্যত্ম পরিমাণ হইতে হঠাৎই যে পরিশ্রম, যে অধ্যবসায় প্রয়োজন

তাহার দ্বারা কত ভাদুঁনের যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়। প্রকৃতিকে যতবার একটি স্থান হইতে কোন ক্রমে হটাইবে ততবার সে কিরিয়া অধিকার করিতে চেষ্টা করিবে—সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া সৈকত-বক্ষ হইতে একবার সরিয়া যাইতেছে, পরক্ষণেই আবার আসিয়া ঢাকিয়া ফেলিতেছে। প্রকৃতির যে কুটিল সমরনীতি তাহারই বা বিচিত্রতা নিরূপণ করিবে কে? শত্রুভাবে मित्रভাবে নিরপেক্ষভাবে, গোপনে, প্রকাশ্যে, উদ্ধৃ হইতে অধঃ হইতে পার্শ্ব হইতে কখন কিরূপে যে সে আক্রমণ করিবে তাহার স্থিরতা কিছু আছে কি? তবুও প্রকৃতি জয় করিব—এই আদর্শেরই আমরা সাধক। সকল দিক দেখিতে হইবে কিন্তু দেখিয়া প্রাণ নিরাশ হইবে না, হৃদয় দোলাচল হইবে না। সাহস বাহার যত, সিদ্ধি তাহার তত—for the boldest the highest wisdom—চাই শুধু অক্লান্ত পরিশ্রম, অটুট অধ্যবসায়। ধীরচিন্ত প্রশান্তবুদ্ধি লইয়া বুঝিতে হইবে কোথায় কি জয় করিতে হইবে, তাহার কোথায় কি কতখানি প্রতিবন্ধক, তাহার পর ক্রমাগত ছেদহীন অবকাশহীন শক্তিপ্রয়োগ। প্রথম প্রথম পরাজয় হইবেই কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইবার কিছুই নাই। পরাজয়ের বিফলতারও বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ শক্তি প্রয়োগেই শক্তির বৃদ্ধি—জয়াজয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও। দ্বিতীয়তঃ বিফলতা অধুনিসংঘাতে দেখাইয়া দেয় সাধকের অভাব, সাধক ধরিবেন কোন্ পন্থাটি। তৃতীয়তঃ বিফলতা বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া সাধকের দৃষ্টি সতর্ক, উদারপ্রসারী, সত্যগর্ভ হইয়া উঠে। ক্রমাগত যে জয়ের মধ্য দিয়া জয়ে পৌঁছিয়াছে তাহার দৃষ্টি চলিয়াছে ঋজুরেখায়, জগতের যত তির্যক গতি যত কুটিল রহস্য সে সকল তবু তাহার কাছে আবর্তিত। সমস্ত জগতের বৈচিত্র্য লইয়া বৈচিত্র্যের মধ্যে অধিষ্ঠানই যখন আমাদের লক্ষ্য তখন যত বিচিত্রতার উপলব্ধি আমাদের হয়, তাহা জয় হউক

দেবজন্ম

পরাজয় হউক, সুখ হউক দুঃখ হউক, পাপ হউক পুণ্য হউক ততই আমাদের সাধনার পূর্ণতা।

পথ অতি দুর্গম, সমস্ত প্রকৃতি আমাদের বিরুদ্ধে, বীরহৃদয়ের পুরুষকার লইয়া আমাদেরিগকে দাঁড়াইতে হইবে। তবুও ইহাই যে সব সত্য একরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে। আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়াছি কিন্তু কে চালাইয়া লইয়াছে, কাহার প্রেরণায়? যে আকাংক্ষাসুখ আমাদের নয়নে প্রতিভাত, যে কল্পনা আমাদেরিগকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহা আদৌ উৎপন্ন হইল কোথা হইতে? দেবজন্মের স্বপ্ন মানুষ বিশ্বাস করে নাই তবুও যুগে যুগে দেখিয়াছে কেন? আমরা মনে করি এ স্বপ্ন প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত ভবিষ্য দৃষ্টি। বাহ্যতঃ প্রকৃতি আমাদের শত্রু কিন্তু তাহারই গুপ্ত প্রেরণা অনুসারে আমরা চলিয়াছি, তাহারই অবশ্যস্বাভাবী পরিণামকে কার্যতঃ প্রতিকলিত করিতে আমরা উদযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনা ইহাই—প্রকৃতির এই গুপ্ত ফলপ্রবাহের সহিত মিলিত হওয়া, তাহাকে প্রকাটিত করা তাহার বলে জয়ী হওয়া। প্রকৃতি দিয়াই প্রকৃতির জয়—নতুবা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত প্রয়াসেরই বা সাধ্য কি?

এইখানেই যোগসাধনার গুপ্ততন্ত্র। সাধকের নিজের শক্তি নিজের অধ্যবসায় দ্বারা নিজের অতীত এক শক্তি, নিজের নিগূঢ় এক প্রেরণাকে জাগাইয়া তুলে। প্রকৃতির উপরে রহিয়াছেন যে পুরুষোত্তম তাঁহার যজ্ঞভূত হইবে সাধক, সাধকের শক্তির মধ্যে তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি খেলিতে থাকিবে। তবেই প্রকৃতি চিনিবে আপনার অন্তরতম প্রেরণা, আপনার প্রভুর আদেশ, তবেই সে-আদেশ পালনে সে তৎপর হইবে। ইহাতে সাধকের বাহ্য চেষ্টার যে দ্বন্দ্ব হইবে এমন নয়, পাহাড়-গহ্বর সমতল হইয়া আমাদের জন্য যে কন্টক-বিহীন পুষ্প-বিকীর্ণ সুরম্য রাজমার্গ উন্মুক্ত করিয়া দিবে তাহাও নয়। সংগ্রাম করিতেই হইবে, লনাটে

ষণ্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিবে, পদতলে রক্তবিন্দু ফরিবে কিন্তু ক্লেশ রহিবে না ।
 কারণ, তখন আমরা জানিব আমাদের শ্রম বিফল নহে—ভগবৎ ইচ্ছার
 প্রতিবন্ধী কে ? তখন স্থির নিশ্চিত, গম্যস্থান আমাদের আয়ত্তাধীন,
 অমৃতের পুত্র আমরা, দিব্যধাম আমাদের সম্মুখভাগে ।

সুখ দুঃখ ও আনন্দ

সুখ বা দুঃখ মানুষের আগল কথা নয়। মানুষের আগল কথা আনন্দ। সুখ দুঃখের খেলা আত্মার মধ্যে নাই, সে খেলা হইতেছে প্রাণে। আনন্দেরই খেলা আত্মার মধ্যে। বিষয়ের স্পর্শ—সে স্থূল বস্তু হউক আর অন্তরের ভাব হউক—তাহা আমাদের প্রাণে সর্বদা ঢেউ তুলিয়া দিতেছে, ইহার কতকগুলি সুখকর আর কতক দুঃখকর। কোন্‌গুলি সুখের আর কোন্‌গুলি দুঃখের হইবে তাহা নির্ভর করে আমাদের প্রাণের গঠনের উপর, আমাদের সংস্কারের উপর। কিন্তু এই প্রাণের এই সংস্কারের স্তরে, আমাদের জাগ্রত চেতনায়, সুখ বা দুঃখের যে চেউটি উঠুক না কেন, অন্তরের যিনি পুরুষ যিনি আত্মা তিনি একান্ত সুখ বা দুঃখ কিছু অনুভব করেন না, সুখ বা দুঃখ হইতে তাঁহার যে নিগূঢ় অনুভূতি তাহা হইতেছে আনন্দ।

আমরা বলিয়া থাকি, মানুষ দুঃখ চায় না, মানুষ চায় সুখ। দুঃখের স্পর্শে সে সঙ্কুচিত হইয়া আসে, সুখের স্পর্শে সে আপনাকে বিকশিত করিয়া দেয়। আগুন স্পর্শের ফল দাহ, জ্বালা—দুঃখ, তাই আগুনের দিকে কেহ হাত বাড়াইয়া দেয় না। আর স্বভোজ্যের সুপেয়ের ফল তৃপ্তি, আরাম—সুখ, তাই সেদিকে মানুষ আগ্রহভরে ছুটিয়া চলে। কিন্তু মানুষ যদি দুঃখ না-ই চায়, তবে দুঃখ সে পায় কেন? মানুষের অন্তরাত্মা যে-জিনিষটির প্রতি একেবারে বিমুগ্ধ, মানুষ সে-জিনিষটিকে কি করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবে? প্রকৃতপক্ষে, মানুষ যে দুঃখ পায়,

তাহার কারণ সে দুঃখকে বরণ করিয়া লয়, ইহাতে তাহার অন্তরাঙ্গার একটা অনুমতি আছে, নতুবা দুঃখ তাহাকে ছুঁইতেই পাইত না। পুরুষ যাহাতে আঞ্জা বা অনুমতি দেয় না, প্রকৃতি তাহা কখনই করিতে পারে না। দুঃখের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে, যাহা আত্মার তৃপ্তি, এমন একটি রস আছে আত্মার পক্ষে যাহা স্বপ্নের এই জিনিষটিই আনন্দ। পতঙ্গ যে দীপে পুড়িয়া মরিতে ছুটে, মানুষ যে উদ্যতবস্ত্র কামানের মুখে বাঁপাইয়া পড়ে, ইহা শুধু তাহার স্বভাবের বিকৃতি বা আকস্মিক অন্ধ উদ্বেজনা কিছু নয়। মৃত্যুর মধ্যে, বেদনার মধ্যে একটা নির্গূঢ় রস, আনন্দেরই সন্ধান পায় বলিয়া সেই দিকে তাহারা ধাইয়া চলে। সুখেরও আনন্দ আছে, দুঃখেরও আনন্দ আছে—আমাদের অন্তরাঙ্গা এই উভয় প্রকার আনন্দেরই রস ভোগ করে।

অজ্ঞান অশক্তি অসম্পূর্ণতা, রোগ, জরা মৃত্যু এই সকলের দুঃখ মানুষকে প্রতিনিয়ত জর্জরিত করিতেছে, তবুও এই সকলকে আলিঙ্গন করিয়াই সে দিনপাত করিয়া চলিতেছে। কারণ, বাহ্যতঃ এ সকল জিনিষ তাহাকে যতই কষ্ট দিক না কেন, তাহার অন্তরাঙ্গার কিন্তু এ সকলে অনুমতি আছে, শুধু অনুমতি নয়, বিলাসই আছে। মানুষকে বল সে অনৃতের সম্মান, ইচ্ছা করিলেই সে দেবতা হইতে পারে, সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞানবান হইতে পারে—সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিবে। এই অবিশ্বাস জিনিষটি কি? অবিশ্বাস হইতেছে অন্তরাঙ্গার অনুমতির অভাব। অন্তরাঙ্গা যে-বস্তুটি চায় না, সে-বস্তুটির উপর সে শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে পারে না। দাসজাতিকে মুক্ত করা এত কঠিন কেন? কারণ বাহ্যতঃ শতভাবে নিপীড়িত হইলেও তাহার অন্তরাঙ্গা দাসত্বের মধ্যেই কি একটা তুষ্টি তৃপ্তি—একটা আনন্দই পায়। আসল কথা প্রাণের অনুভূতি নয়, প্রাণের চাওয়া বা না-চাওয়া নয়, তাহা হইতেছে আত্মার ইচ্ছা—সে ইচ্ছা। সুতরাং দুঃখ হইতে যদি নিকৃতি পাইতে চাই তবে এই অন্ত-

দেবজন্ম

রাশ্যার মুখটি ফিরাইয়া ধরিতে হইবে, দুঃখের খেলায় সে যেন আর অনুমতি না দেয়। তবেই মূলটি নষ্ট হইবে—ইহাকেই বলা হইয়াছে দোষবীজ-ক্ষয় এইখানেই মুক্তির প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, আমার অন্তরাশ্যার আনন্দ যদি দুঃখেরও মধ্যে, তবে দুঃখের প্রতি সে বিরাগ হইবে কেন, দুঃখ নষ্ট করিতে বা ছাড়িতে সে চাহিবে কেন? আনন্দনয়ের কাছে যখন সবই আনন্দের, আর অন্তরে যখন আমি আনন্দনয়, তখন অজ্ঞানের অশক্তির পাপের দুঃখের আনন্দ লইয়াই বা আমি চিরদিন থাকিব না কেন? কি তবে আমার চরিতার্থ হইতেছে না? তারপর দুঃখ যদি আশ্রয় কাছে দুঃখ নয় বলিয়াই প্রতীত হইল, তাহারও মূল যদি আশ্রয় আনন্দে তবে দুঃখ কোনদিন জগৎ হইতে নির্বাসিত হইতে পারে না, সে চেষ্টা করাও উচিত নয়। দুঃখ না থাকিলে জগতের একটা বিশেষ বৈচিত্র্যই চলিয়া যাইবে। জগতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না কারণ আশ্রয় যে দুঃখ অর্থাৎ দুঃখের যে রসটি তাহাও চায়—হওয়া উচিতও নয় কারণ তবে লীলার ক্ষেত্র ঠিক ততখানিই সঙ্গীর্ণ হইয়া উঠিবে। সেই জন্যই আমরা কখন কখন শুনিয়া থাকি বলা হয়, মানুষের চরিতার্থতা তাহার সমস্ত মানুষত্ব লইয়া অর্থাৎ সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, আলো অঁধার এই দ্বৈতেরই লীলায়। মানুষকে দুঃখহীন চিরদীপ্ত স্বর্গের দেবতা করিয়া তুলি মানুষত্বের বিলোপ সাধনমাত্র—কবি তাই গাহিতেছেন—

এই যে খেলা খেল্চ কত ছলে

এই খেলা ত আমি ভালবাসি

এক দিকেতে ভাগাও অঁধিজলে

আরেক দিকে জাগিয়ে তোল হাসি।

এ কথার উত্তর পাইতে হইলে আগাদিগকে মানুষের প্রকৃতি ও ইহার মধ্যে দুঃখের স্থান সম্বন্ধে আর একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি মানুষের আত্মা শুধু আনন্দময়—কিন্তু এখানে কতকগুলি সুস্কৃতর বিভেদ মনে রাখা প্রয়োজন। কারণ মানুষ হইতেছে একটা জটিল সমষ্টি। মানুষের আত্মা, তাহার রস-গ্রাহী সত্তা, তাহার অন্তরঙ্গ পুরুষও এক নয়, তাহা বহু। প্রধানতঃ তিনটি নির্দেশ করা বাইতে পারে। প্রথম, তাহার দেহের ও দেহের অন্তর্গত প্রাণের মধ্যে যে আত্মা ; দ্বিতীয়, তাহার মানসক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা যে আত্মার ; তৃতীয়তঃ, দেহ ও মনের উপরে, অন্তরের অন্তরে অবিস্তৃত যে নিগূঢ় আত্মা। শারীর পুরুষ, মানস পুরুষ আর অধ্যাত্ম পুরুষ—ইহাদিগকে যথাক্রমে আমরা এই তিন নামে অভিহিত করিতে পারি। অথবা উপনিষদ যেমন বলিয়াছেন—অনুময় ও প্রাণময় পুরুষ, মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষ।

এখন, জগতের স্পর্শ—যাহাকে আমরা সুখ দুঃখ নাম দিয়া থাকি— তাহা এই বিভিন্ন পুরুষের কাছে বিভিন্ন বর্ণে প্রতিভাত হইয়া দেখা দেয়। মানুষ যে-স্তরের উপর দাঁড়াইয়া আছে, যে পুরুষটির সহিত তাহার জাগ্রত সম্বন্ধ, সেই স্তরের সেই পুরুষের চেতনার ধর্মেই তাহার বিষয়স্পর্শ তাহার সুখ দুঃখের উপলব্ধি রঙ্গিয়া উঠিতেছে। যে-মানুষ পরিচিত কেবল তাহার শরীরের সহিত, যাহার জীবন বেশীর ভাগ পশুর জীবন, তাহারও আত্মা অর্থাৎ অনুময় ও প্রাণময় পুরুষ দুঃখ হইতে এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে—শরীরে ও প্রাণে সজ্ঞানে বেদনাই সে অনুভব করুক না কেন। কিন্তু সে আনন্দ এক বিপরীত আনন্দ, দুঃখ বলিয়াই দুঃখের যে রস, দুঃখের সম্পূর্ণ বোধই আছে অথচ তাহার ভিতরেই থাকিয়া কেমন এক রসাস্বাদন। ঝালের লবণের তীব্রতার তীক্ষ্ণতার যেমন এক প্রীতিকর স্বাদ—চাই না যাহা, জোর করিয়া ফেলিয়া দিতে চাই যাহা তারও সাথে রহিয়াছে যেমন এক নিগূঢ় মিলন সম্বন্ধ, এক নিবিড় আকর্ষণ। এই শরীর ও প্রাণশক্তির জগৎ হইতে

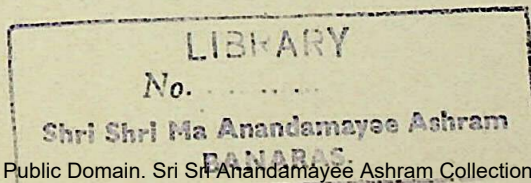
দেবজন্ম

যখন উঠিয়া মন জগতে প্রবেশ করি, মানুষ যখন একান্তই পশু নয়, শুধু দেহের আসদ্‌লিপ্সা ও প্রাণের বাসনার নিতান্ত দাস নয়, যখন তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে বুদ্ধির খেলা, জিনিষকে জানা চেনা বুঝা জর করা, তখন বস্তু স্পর্শে তাহার মধ্যে জাগে আর এক প্রকার আনন্দ—দুঃখ হইতে তাহার এই ননোময় পুরুষ গ্রহণ করে আর এক প্রকার রস। মানস পুরুষ শারীর পুরুষের ন্যায় দুঃখের মধ্যে আর অবস্থান করে না, দুঃখের উপর দাঁড়াইয়া—‘উদাসীন’। সেখান হইতে দুঃখের খেলাকে সে সাক্ষীরূপে অবলোকন করিতে থাকে, দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুঃখের অনুভূতি (feeling) নাই, আছে শুধু দুঃখের প্রতিভূতি (perception)। প্রাণময় ও অনন্য পুরুষের কাছে দুঃখ যেমন স্পষ্ট স্ফুট জাগ্রত যেমন জমাট, এখানে তেনন নয়, এখানে দুঃখের আছে একটা ছায়া, একটা প্রতিবন্ধি মাত্র। কিন্তু মানুষের আর একটি স্তর আছে, তাহা এই মনেরও অতীত, যেখানে মানুষ আর মানুষ নয়, দেবতা। দেবতার প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানলোকে—এখানে দুঃখের ছায়া মাত্র নাই, স্মৃতরাং সুখ দুঃখের শেষ প্রেরের কোন দ্বৈত নাই—এখানে আছে শুধু আনন্দ, অনাবিল অখণ্ডিত আনন্দ। মানুষের মধ্যে তাহার এই বিজ্ঞান-ময় পুরুষ যখন জাগরিত হইয়াছে, সে যখন তাহার অধ্যাত্মসভায় প্রতিষ্ঠিত, উহারই বর্গে তাহার সকল অনুভূতি সকল উপলব্ধি রক্ষাইয়া উঠিয়াছে তখন দুঃখ একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, দুঃখের আনন্দ বলিয়াও কোন জিনিষ তখন আর নাই।

স্মৃতরাং আমরা দেখিতেছি দুঃখের প্রতি যে অনুমতি তাহার স্থান মানুষের নিম্নতর স্তরে। প্রাণে ও দেহে আশ্রয় এই অনুমতি active, মনে উহা passive। কিন্তু বিজ্ঞান বা আনন্দলোকে তাহা কিছু নাই; দুঃখের সেখানে পরিনির্বাণ। জগতের মানুষের বিবর্তন চলিয়াছে, দেহ প্রাণ মন এইরূপ স্তরের পর স্তর পার হইয়া আনন্দলোকে

প্রতিষ্ঠার দিকে। জগতের মানুষের সার্থকতাও এইরূপ নিম্নতর স্তর সকলের রস ভোগ করিয়া, সে সকলকে কাটাইয়া ক্রমে উর্দ্ধ তর উর্দ্ধ তন স্তরের ধর্মে আপনাকে মগ্নিত করা। দেহ প্রাণ মনের ধর্ম পার হইয়া বিজ্ঞানের আনন্দের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ইহাই প্রকৃতির নিগূঢ় প্রেরণা, ভগবানের দিব্য ইচ্ছা—ইহাই সৃষ্টির উর্দ্ধ গতির মূল রহস্য। মানবজাতির বর্তমান প্রকৃতি, তাহার জীবন, তাহার প্রতিষ্ঠান সকল গঠিত নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে প্রধানতঃ প্রাণময় ও অণুময় পুরুষের প্রেরণায়, কিয়ৎপরিমাণে মনোময় পুরুষের প্রেরণায়। কিন্তু ইহাই তাহার সনাতন চিরন্তন সত্য নয়। অশক্তি অজ্ঞান রোগ জরা মৃত্যু সকল রকম দুঃখের মধ্যেই যে আত্মার আনন্দ তাহাই শেষ কথা নয়। এ একটি বাপ মাত্র। দুঃখকে সহিয়া থাকি, এমন কি দুঃখকে জয় করাও আত্মার পূর্ণ অভিভাব্যক্তি নয়। দুঃখের বীজকে ভস্মীভূত করিয়া এক অব্রণ অক্ষত আনন্দে অধিষ্ঠিত হওয়াই আত্মার পূর্ণতন পূর্ণতা। শুধু এই আত্মার নিগূঢ়ে নয় কিন্তু মনে প্রাণে দেহে, শুধু অন্তরে নয়, বাহিরে প্রকাশের মধ্যেও দুঃখের সকল বোধ সকল কারণকে দূরীভূত করিয়া, আনন্দেরই বিগ্রহ-রাজিকে গড়িয়া সাজাইয়া তুলিতেই সৃষ্টির সার্থকতা মানুষের চরিতার্থতা।

এখন কি প্রকারে অন্তরে বাহিরে এই আনন্দলোক স্থাপন করা যাইতে পারে সে কথা আমরা সহজেই বুঝিব—তাহার ইঙ্গিত আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। মানুষ সাধারণতঃ দুঃখের দাস, যখন দুঃখ ভোগ করে তখন দুঃখ ব্যতীত আর কিছু অনুভব করে না, দুঃখের পশ্চাতে আর কোন রকম অনুভূতি কিছু আছে কি না তাহা দেখিবার কোন অবকাশই সে পায় না, দুঃখেতে সে একান্ত মুহ্যমান। সকলের প্রথমে তাই অনুভব করিতে হইবে এই দুঃখ কেবলই দুঃখ নয়, ইহার মধ্যেই লুকাইয়া আছে আনন্দ, আমার দেহের প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ যে আত্মা



দেবজন্ম

তাহার প্রীতি। সে জন্য চাই তিতিক্ষা অর্থাৎ সহ্য করা। রোগ যখন পাইয়া বসিয়াছে, যাতনায় যখন আপনাতাহার তখন জোর করিয়া সে বেদনা যাতনাকে ধারণ করিতে হইবে, সমস্ত আবারটিকে দৃঢ় সংহত করিয়া তুলিতে হইবে যেন তাহা ভাঙ্গিয়া না পড়ে। ইহা ইচ্ছাশক্তি বা তপোবলের কাজ, অভ্যাসের দ্বারা এটি আয়ত্ত করিতে হয়। তিতিক্ষার ফলে, দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও আমরা সন্ধান পাইব দুঃখের অন্তরালে কল্পপ্রবাহের মত বহিয়াছে শারীর পুরুষের যে আনন্দ। তিতিক্ষা সাধনে কিছুদূর অগ্রসর হইলে তারপর চাই উদাসীনতা, মনকে টানিয়া উপরে উঠাইতে হইবে, ধারণা করিতে হইবে দুঃখ অর্থাৎ দুঃখ বলিয়া যে অনুভূতি-তরঙ্গ সব চলিতেছে তাহা আমাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমার নিম্নতর স্তরে আমার শরীরে ও চিন্তে ফুটিয়া উঠিতেছে, আমি হইতেছি দ্রষ্টা, দেখিতেছি মাত্র। আমি হইতেছি দর্শক—এই নাট্য-লীলা, এই বিরোগোত্তম দৃশ্যের আনন্দই উপভোগ করিতেছি। এ অবস্থায় দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না—শরীরে রোগ আসিয়াছে কিন্তু সে রোগ আমার নয়, পদ্যপত্রের উপর জনবিন্দুর মত তাহা টলিয়া টলিয়া পড়িতেছে। এই উদাসীনতার পর হইতেছে দৈশুরে প্রানুরক্তি, ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠা। কারণ ইহারই ফলে আমরা সেই পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হই যাহা ভগবানের নিত্য নিগূঢ় স্বরূপ। তখনই ভগবান আমার মধ্যে আমার বিজ্ঞানময় সত্তাটি লইয়া আবির্ভূত হন। তখন যে আমি দুঃখ জয় করিয়াছি তাহা নয়, দুঃখের অস্তিত্বই তখন আমার মধ্যে নাই। আনন্দময় পুরুষ আনন্দের বিজ্ঞানের ধর্মে আমার প্রতি স্তর তখন গড়িয়া তুলিয়াছেন। দুঃখের অনুভূতি যখন গিয়াছে দুঃখের কারণও তখন বিদূরিত হইয়াছে। এই লোকে আমি যে শুধু দিব্য দ্রষ্টা তাহা নয়, আমি প্রধানতঃই হইতেছি দিব্য শ্রষ্টা। সেখানে আমি যে দুঃখের দৃশ্য নির্বিকারভাবে অথবা

আনন্দের সহিতই উপভোগ করিতেছি তাহা নয়, আমি এক নূতন দৃশ্য গড়িয়া তুলিয়াছি। রোগ জরা মৃত্যু হইতে আমি যে দুঃখ অনুভব করি না, শুধু এইটুকুই নয়, রোগ জরা মৃত্যু সেখানে আদৌ নাই। আমি তখন কেবলানন্দের অমৃতত্বে আপূর্ণ—স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যে তেজে ভরা—আমার প্রতি অঙ্গ দেবসজ্জায় গঠিত।

আত্মসমর্পণের কথা।

ভগবানে আত্মসমর্পণ অর্থ নিশ্চেষ্টতা নহে। আমি কিছু করিতেছি না, অদৃশ্য এক শক্তিই সব করিতেছে, সুতরাং আমি কিছু করিব না, সেই শক্তিই সব করিয়া দিবে, আমার কাজ শুধু চুপ করিয়া থাকা, বসিয়া-বসিয়া দেখা—আত্মসমর্পণ বলিতে এই কথাটিই সকলের আগে মনে জাগে, কিন্তু এটি আমাদের মস্ত ভুল। মনে রাখিতে হইবে আত্মসমর্পণ অর্থ বাহিরের নিশ্চেষ্টতা নয়, কর্ম্মেচ্ছিয় সকলকে নিস্তদ্ধ করিয়া রাখা নয়। আত্মসমর্পণ হইতেছে সকলের প্রথম আত্মার সমর্পণ, অর্থাৎ অন্তরের অন্তরে আমি করিতেছি এই বোধের পরিবর্তে ভগবান করিতেছেন এই বোধের উপলব্ধি; কর্ম্মজীবন হইতে নিরস্ত হওয়া নয়, যে-সব জিনিষ করিতেছিলাম, করিতেছি বা করিব তাহা সব বন্ধ করিয়া দেওয়া নয় কিন্তু সে-সব জিনিষ করিতে থাকা ভিতরে ভগবান করিতেছেন এই ভাবটি লইয়া। বাহিরের জীবনের কতখানি কি পরিবর্তন হইল না হইল সেটা তত প্রধান কথা নয়, আগে দেখিতে হইবে ভিতরের এই ভাব, এই চেতনাটি কত স্ফুট কত স্পষ্ট কত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

ভিতরের চেতনার পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গীর কম্পাসটি কেবল ঘুরাইয়া ধরা—ইহাই হইতেছে আত্মসমর্পণ। মানুষের সাধারণ চেতনা এই যে সে নিজে জগৎ হইতে অর্থাৎ আর সকল হইতে পৃথক হইয়া, জগতের আর সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জোর করিয়া যাহা করিবার তাহা করিতেছে। এই ধারণা এই ভাব, এই চেতনাকে বদলাইয়া বোধ করিতে হইবে যে আমার উপরে, আমার অন্তরে আমাকে ঘিরিয়া এক মহাশক্তি

বিশ্বের সকলের সমবেত এক নিগূঢ় প্রেরণায় আমার কর্মরাজি উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে। এই চেতনাটুকুর পরিবর্তনের জন্য হাত পা গুটাইয়া থাকার প্রয়োজন নাই, অত্যন্ত কষ্টেষ্ণনা সকলকে নিরসন করিবারও দরকার নাই। বাহিরের সে সকল জিনিষ সমানভাবে করিতে করিতেই ভিতরের চেতনাটুকু পরিবর্তন করা যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য কেন এই পরিবর্তন? কারণ, এ পরিবর্তন হইতেছে বিকৃত হইতে সহজে, কুটিল হইতে ঋজুতে, ভুল হইতে সত্যে পরিবর্তন। আমি করিতেছি তাই হইতেছে—এ কথাটির মত অসত্য আর কিছু নাই। ‘আমি’ কি? ‘আমি’ হইতেছে আমার এই দেহ, এই প্রাণ, এই মনবুদ্ধি। আমার কর্ম নিয়ন্ত্রিত হইতেছে আমার এই দেহের অবস্থা অনুসারে, আমার ভোগ নির্ভর করে আমার প্রাণের সামর্থ্য অনুসারে, আর সবই আমি ঠিক করি, চালাই আমি ভাবিয়া চিন্তা করিয়া বিচার করিয়া। কিন্তু তাই কি? বাস্তবিক পক্ষে ত দেখি আমার বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া কত জিনিষ হইয়া যাইতেছে, কত সময়ে দেখি আমার প্রাণের আমার দেহের অবস্থাকে টিটকারী দিয়া কত বিপুল কর্মের স্রোত আমার মধ্যে বহিয়া যাইতেছে। আমার যেটুকুকে আমি বলিয়া সজ্ঞানে বোধ করি তার আশেপাশে চারিদিকে কি একটা বৃহত্তর ‘আমি’ ছড়াইয়া আছে, আর একটা বিরাট জগতের চাপেই যেন আমার ক্ষুদ্র জগৎটি ঘুরিয়া চলিয়াছে! জড়বিজ্ঞানই ত আজ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে আমার এই দেহ আর সকল দেহের স্থূলভূতের সাপে জুড়িয়া নিশিয়া আছে, আমার প্রাণ বিশ্বপ্রাণের ছন্দেই দুলিতেছে, আমার মন-বুদ্ধি বিশ্বমনেরই একটা রশ্মি মাত্র। আমি, অহঙ্কার হইতেছে সেই চেতনা, সেই বোধ যাহা বিশ্বকে সমগ্রকে কাটিয়া ভাগভাগ করিয়া দেখে, একটা অংশকে ফুলাইয়া তুলিয়া বিশ্বের সমগ্রের বিরুদ্ধে খাড়া করে আর বিশ্বাস করে সেই অংশই বিশ্বকে সমগ্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

চেউটি যেন মাথা তুলিয়া বাইয়া চলিয়াছে আর মনে করিতেছে তাহারই
আবেগে সমস্ত সাগর হেলিতেছে দুলিতেছে।

ঠিক বলিতে গেলে বলা উচিত, আমি কর্ত্ত করিতেছি না, কর্ত্ত
আমার মধ্যে হইয়া বাইতেছে। আমি কর্ত্তা নহি, কর্ত্তা আর একজন।
কর্ত্তা যদি হই তবে সকল কর্ত্তকে প্রত্যেক কর্ত্তকে আমার মুঠির মধ্যে
রাখিতে পারি না কেন, কোথায় কত কর্ত্ত আমার মধ্যে আমার অজ্ঞাত-
সারে আমার বিধানকে দৃকপাত না করিয়া যে হইয়া বাইতেছে তাহার
হিসাব নিকাশও কিছু দিতে পারি না কেন? তবে আমার ধারণা
আমার অনুভব হয় বটে যেন আমিই কর্ত্তা আমিই করিতেছি। কিন্তু
এ অনুভবের, এ ধারণার মূল্য কি? পুতুল যদি মনে করে সে নিজেরই
চেষ্টায় হাত পা নাড়িতেছে, কলম যদি মনে করে নিজেরই সামর্থ্যে সে
লিখিয়া চলিয়াছে—সে মনে করার মূল্য কি?

স্বতরাং সমস্ত আত্মসমর্পণ হইতেছে এই মনে না করাটির মধ্যে।
চোখে ছানি পড়িলে জিনিষ সব দেখায় যেমন ঘোলা ঘোলা সেই রকম
অহঙ্কারের ছানির ভিতর দিয়া জগৎটাও দেখায় বিকৃতরূপে। চোখের
ছানি কাটিয়া গেলে জিনিষ সব যেমন স্পষ্ট যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠে,
এই অহঙ্কার কাটিয়া গেলে জগৎ তেমনি আপনার স্বরূপ লইয়া দেখা
দেয়। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইলে করিতে হইবে
ভিতরে, বাহিরের জগতের উপর নয়। বাহিরের কর্ত্তজীবনের জগৎ
যেমন চলিয়াছে তেমনই চলুক, ভিতর স্পষ্ট ঋজু হইয়া আসিলে বাহির
আপনা হইতেই স্পষ্ট ঋজু হইয়া উঠিবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই যে ভিতরের অস্ত্রপ্রয়োগ এটি কে করিতেছে?
চোখের রোগের জন্য ডাক্তার থাকিতে পারে, কিন্তু মনের রোগের
আমি নিজেই কি নিজের চিকিৎসক নহি? কারণ মনে করা বা না-করা,
চেতনার ভাবের দিক পরিবর্তন সে কি আমারই কার্য্য নহে, আমিই

আত্মসমর্পণের কথা

তার কর্তা নই, সে কি আমার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে না ? সুতরাং আমি আমাকে যে আমার কর্তার কর্তা নিয়ন্তা বলিয়া সর্বদা বোধ করি সে বোধ একেবারেই ভুল বা গায়া না হইলেও হইতে পারে ।

ঠিক কথা । কিন্তু এই কর্তা এই নিয়ন্তা ‘আমি’ বলিতে যাহা বুঝি অর্থাৎ অহঙ্কার নয়, তাহা হইতেছে আমি বোধের পিছনে আছে যে জীব যে পুরুষ । এই জীব এই পুরুষ ভগবানের বিশ্বসত্তা বিশ্ব-চেতনা বিশ্বশক্তি বিশ্বআনন্দের একটা স্কুলিঙ্গ, একটা রশ্মি । ইহাকে কেন্দ্র করিয়া, ইহার উপর ভর করিয়া এই জগতের বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রতি নিয়ত বিকশিত হইয়া চলিয়াছে । ইহাই আমার আত্মা, আমার প্রকৃত আমি, যেখানে আমি মুক্ত আমার কর্তার ঈশ্বর—কারণ এখানে আমি ও ভগবান একান্ত হইয়া গিয়াছে । প্রকৃতির নিয়তির বাধ্যবাধকতার মধ্যে ইহার প্রতিচ্ছবি যাহা পড়িয়াছে তাহাই হইতেছে ক্ষুদ্র আমি, ভুল আমি, অহঙ্কার । অহঙ্কারের মধ্য দিয়া আমার তুরীয় আমি উঁকি দিয়া দেখিতেছে মাত্র, কিন্তু সে আমি অহঙ্কার নয় । অহঙ্কার প্রকৃতির একটা গ্রন্থী, একটা আবর্জা, একটা ফল ; তুরীয় ‘আমি’ প্রকৃতির উপরে, প্রকৃতির ঈশ্বর । এই সত্য-আমিই আমার কর্তা নিয়ন্তিত করিতেছি, কিন্তু অজ্ঞানবশে ছায়া-আমি মনে করে সে-ই কর্তা করিতেছে । আমার নিতৃত আত্মার, অন্তঃপুরুষের ইচ্ছার ইষণায় আমি যাহা করিতেছি, মনে করি তাহা করিতেছি বাহিরের নামরূপের আমি, বিচার বিতর্ক করিয়া, তাহার অভ্যন্ত প্রাণের আবেগে কাননায়, তাহার পরিচিত শরীরটুকুর আশ্রয়ে । এ কথা সত্য হইতে পারে যে ঐ অন্তর্য্যামী পুরুষ এই মনবুদ্ধির, এই প্রাণের এই শরীরের সাহায্য নহিতেছে কিন্তু তবুও এ সব করণ মাত্র, কারণ নয় । ইহাদের যে ধর্ম যে সিদ্ধান্ত সে সকলকে একান্ত করিয়া লয় নাই—সময়ে তাহাদিগকে মানিয়া

দেবজন্ম

লইতেছে, সময়ে আবার তাহাদের উল্টা পথে যাইতেছে, চালিয়া নৃতন করিয়া গড়িতেছে। আগার ভাগ্য আনি সৃষ্টি করিতেছি—বো বংশধকঃ স এব সং—এ পুরুষকারের বার্তা সত্য কথা। ‘পুরুষকার’ সত্য কিন্তু সে জন্য ধরিতে হইবে ‘পুরুষ’কে, চলিতে হইবে চালাইতে হইবে পুরুষের ইষণায়। কিন্তু এই পুরুষের শ্রদ্ধা আমরা বুঝিতে পারি না ধরিতে পারি না, আমরা তাহার বদলে তাহার বিকৃতরূপ বা ছায়াদেহ সেই অহঙ্কারের আবেগকেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করি—ইহাই মায়া, ইহাই মতিভ্রম। স্মরণ্য আমরা দেখিতেছি আত্মসমর্পণের মধ্যে আছে দুইটি ভাগ, দুইটি গতি। এই দুইটিকেই যুগপৎ ধরিতে হইবে। প্রথম হইতেছে আপনাকে চালিয়া দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, ধীর, স্থির শান্ত উদাসীন হইয়া থাকা—এমন কি বলিতে পারি নিশ্চেষ্ট হওয়া, চুপ করিয়া থাকা অর্থাৎ যন্ত্রের মত হওয়া। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইবে, নিস্তব্ধ হইবে আগ্নি-বোধ; যন্ত্রের মত আপনাকে ছাড়িয়া দিবে মনবুদ্ধি, প্রাণ, দেহ। এই সঙ্গেই আবার জাগাইতে হইবে আগ্নি-বোধের পিছনে যে আছে আত্মবোধ, পুরুষের ঈশ্বরত্ব, তাহারই সজাগ ইচ্ছায় তপঃপ্রয়োগে চালাইতে হইবে মনবুদ্ধিকে, প্রাণকে দেহকে অর্থাৎ হইতে হইবে যন্ত্রী। সাধারণ প্রাকৃত জীবনে এই যন্ত্রীর খোঁজ আমরা পাই না, তিনি থাকেন লুকাইয়া, তিনি সিংহাসন-চ্যুত। রাজা বিহনে রাজ্যের যে অবস্থা, এই অধ্যাত্ম-রাজার বিহনে আমাদের আশারের, আমাদের জীবনেরও সেই অবস্থা। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে, সর্বত্র খেলিতে থাকে বিশৃঙ্খলতা উচ্ছৃঙ্খলতা উদ্ধাম অপচার অত্যাচার—এনাকিজিম্, বোল্শেভিজিম্। বুদ্ধি বিচার করিয়া একটা ঠিক করে—তাও আবার প্রতিমুহূর্তে বদলাইতে থাকে—লইয়া চলে একদিকে, প্রাণের আবেগ ছুটাইয়া চলে আর এক দিকে, শরীর আবার টানিয়া ধরে তৃতীয় দিকে—এই রকমে আমরা নানা টানের মধ্যে পড়িয়া আকুল, উদ্ব্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়ি।

আত্মসমর্পণের কথা

পুরুষ রাজার আবির্ভাবেই কেবল এ সকলের দাবির মধ্যে সংহতি, সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, সমস্ত চলিতে থাকে এক অটুট শৃঙ্খলার, অব্যাহত শক্তিতে।

রাজা নাই, 'আমি' আমলা হইয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছি, আমার খেলায় অনুসারে রাজ্য চালাইতেছি। তাই রাজ্যে এত গোলমাল। সুতরাং আমার প্রথম কাজ আমাকে সরাইয়া ফেলা, আমাকে উৎসর্গ করা। আমি করিব না, যাহার কাজ সেই করিবে, পরের কাজে হস্তক্ষেপ করা আমার কর্তব্য নয়—এই উদাসীন (passive) ভাব। কিন্তু এ ভাব হওয়া চাই প্রধানতঃ ভিতরের ভাব (attitude)। কারণ তাই বলিয়া আমি যদি বাহিরেও একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ি, জড় স্বাধুর মত বসিয়া বাই তাহা হইলেও আমার জীবন-রাজ্যে শৃঙ্খলার শাসনের সৃষ্টি হইবে না। অহঙ্কার এক দিনেই কিছু নষ্ট হয় না, আত্মার উদ্বোধন এক দিনেই হয় না—রাজার আসিতে সময় লাগে, তিনি যে দূরদেশে। সুতরাং ইতিমধ্যে আমার কাজ আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে যতদূর পারি শাসনকে স্ফূর্ত করিয়া ধরিতে, ভিতরে অনুভব করিতে রাজার কি ইচ্ছা হইতে পারে সেই অনুমানের উপর শূদ্ধাসহকারে চলিতে। বাহ্য করিতেছি, করিতে হইতেছে, করিতে হইবে সকলই তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অঞ্জলিস্বরূপ ঢালিয়া দিয়া। যৎ করোষি যদশ্নাষি....। প্রশান্ত-চিত্তে সর্বত্র সমবোধ লইয়া, সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, ভালমন্দ এমন কি ভুল সত্য কিছু না গণিয়া শুধু কর্তব্যক্রিয় দ্বারা কর্ত্ত করিয়া যাইব—ভিতরে আমার অন্তরাঙ্গা তাঁহারই দিকে চাহিয়া থাকিবে। তবে ক্রমে ক্রমে দেখিব সামঞ্জস্য শক্তি আপনা হইতেই বাড়িয়া যাইতেছে, আমার অন্তর্দেবতার ভগবানের শ্রীঅঙ্গুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, আমাকে দেখাইয়া দিতেছে কি করিতে হইবে, কোন দিকে চলিতে হইবে—

দেবজন্ম

শুধু তাহাই নয়, তিনিই যেন তাঁহার নিভৃত প্রতিভার শক্তিসম্প্রসারণে আমাকে চালাইয়া নইয়াছেন।

এই গেল একটা দিক। কিন্তু আমার যে রাজ্য তিনি ত কেবল দূরদেশের নয়, তিনি যে আমারই অন্তরের, আমারই আমি। যাহাকে অহঙ্কার বলিতেছি তাহারই মধ্য দিয়া দৃষ্ণ দেখা দিতেছে আমার অন্তরাত্মা আমার জীবটি, আমার প্রকৃত মার্থ্য সম্ভা। আমি চাই, আমি করি—প্রকৃত পক্ষে এটা হইতেছে ঐ জীবের ঐ পুরুষের জ্ঞান, বোধ। অহঙ্কার তাহারই ছায়া, বিকৃতিরূপ। এই ভিতরের ‘আমির’ শক্তিতেই অহঙ্কারকে গড়িয়া তুলিয়াছি, আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিব, তাহারই প্রেরণায় এই অশুদ্ধ ঋণিত দেহ প্রাপ্ত মন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারই প্রেরণায় ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িব। তাই শুধু passivity-ই আত্মসমর্পণের সবখানি নয়—ইহার সঙ্গে চাই ইচ্ছাশক্তির তপঃশক্তির প্রয়োগ (active will-force)। আমার প্রতি চিন্তা, প্রতি আবেগ, প্রতি ভোগ প্রতি কর্মের মধ্যে আমার জীবাত্মার তপঃশক্তিটিই খেলিতেছে। এই তপঃশক্তিকে যখন একটিনাত্র জিনিষের মধ্যে পুরিয়া রাখি, চারিদিকের সাধে সকল স্বাভাবিক সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলিয়া একটা কেন্দ্রের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া অদ্ধ করিয়া ফেলি—তখনই হইতেছে অহঙ্কারের জন্ম। এই অহঙ্কারের খেলাও পুরুষের একরকম আনন্দ—বিপরীত আনন্দের ফল। কিন্তু এই ভুলের এই বিকৃতির সাধকতা তখনই যখন আবার তাহাকে ঘুরাইয়া সত্যের সহজের মধ্যে উঠাইয়া ধরিতে পারি। অহঙ্কারের মধ্যে আছে একটা জোর করা, চেষ্টা করা, যাহা খাপ খায় না তাহাদিগকে টানিয়া ছিঁড়িয়া খাপ খাওয়া-ইবার প্রয়াস। প্রয়াসের মধ্যে এই জোর করাটুকু, এই চেষ্টা করা-টুকুকে বাদ দিয়া পাই যে সরল অখচ নিবিড় শক্তিপ্রয়োগ তাহাই হইতেছে পুরুষের, জীবাত্মার তপঃ (will)। জীবনের সকল তরঙ্গের মধ্যে

আমার এই তপঃশক্তিকে চিনিয়া ধরিয়া আনাকেই গড়িতে হইবে, ভাঙ্গিতে হইবে।

এক দিকে আমি দাস, আর এক দিকে আমি প্রভু। এক দিকে আমি যন্ত্র আর এক দিকে আমি যন্ত্রী। এক দিকে স্রষ্টি, আর এক দিকে আমি স্রষ্টা। এক দিকে আমি কর্তৃকরণ, আর এক দিকে আমি কর্তা। এক দিকে আমি প্রকৃতি আর এক দিকে আমি পুরুষ। অহঙ্কার হইতেছে প্রকৃতির মধ্যে, স্মৃতরাং এই অহঙ্কার লইয়া আমি বদ্ধ। তপঃশক্তি প্রকৃতির উপরে পুরুষের বৃত্তি, ইহা লইয়া আমি মুক্ত। বদ্ধ যে দিকে সে দিকের ভাব হওয়া চাই সমর্পণ, প্রণতি (passive submission) ; মুক্ত যে দিকে সে দিকের ভাব হওয়া চাই সজাগ শক্তিপ্রয়োগ (active energising) ।

জীব যে, পুরুষ যে—আমার প্রকৃত আমি যে—তাহা হইতেছে পরমাত্মার, পুরুষোত্তমের, ভগবানেরই একটা বিশেষ মুক্তি, তাঁহার স্বরূপেরই একটা দিক। স্রষ্টি করিবার জন্য, বৈচিত্র্যকে জন্ম দিবার জন্য ভগবান আপনাকে আপনি নানা ভাবে দেখিতেছেন—এই এক একটি দেখার ভঙ্গিই হইতেছে এক একটি জীবাত্মা বা পুরুষ। ভগবান যেন নানা কেন্দ্রে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন ব্রহ্মাণ্ডকে বহুরূপী করিয়া তুলিবার জন্য। প্রতি কেন্দ্রে কিন্তু তিনিই বিরাজিত, পূর্ণভাবেই প্রতিষ্ঠিত—শুধু, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য, বিশেষ ব্রত, বিশেষ ধর্মকে খেলাইয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য। জীবাত্মা তাই ভগবানই। ভগবান হইতেছেন মুক্ত সিদ্ধ কর্তা ঈশ্বর ; জীবাত্মাও তাই মুক্ত সিদ্ধ কর্তা ঈশ্বর। অহঙ্কারের মধ্যে ভগবান আপনাকে আপনি আপনার স্বরূপে দেখেন না ; তিনি সেখানে দেন আপনাকে হারাইয়া ডুলাইয়া, তিনি যেন সেখানে পিছন ফিরিয়া থাকেন। জীবাত্মার তপঃশক্তিতে যে জগৎ স্রষ্টি তাহা বৈচিত্র্যের জন্য, কিন্তু তাহাতে

দেবজন্ম

রহিয়াছে অপূর্ব সামঞ্জস্য সঙ্গতি। অহঙ্কারের কাজ এই বৈচিত্র্যকে আরও একধাপ নীচে টানিয়া আনা। বৈচিত্র্যকে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে পরিণত করা। ভগবান অহঙ্কারকে সৃষ্টি করিয়াছেন আপনার মধ্যে ভেদকে চরম করিয়া দেখিবার জন্য। কিন্তু এই ভেদ এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ তাঁহার স্বরূপে নাই, থাকিতে পারে না। ইহার একমাত্র সার্থকতা বৈচিত্র্যকে আরও বিচিত্র করিয়া তোলা, স্তূতরাং সামঞ্জস্য সঙ্গতিকে আরও নিবিড় গভীর করিয়া ধরা।

আমাদের ভুল ঠিক এইখানেই—যে বৃত্তি একটা বিশেষ একটা সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অর্দ্ধ পথ পর্য্যন্ত আসিয়া যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য, তাহাকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, তাহাকে সনাতন সাথী করিয়া ধরিয়া রহি। ভুলের সাথে পরিচয় না হইলে সত্যের উপলব্ধি যেমন পাকা হয় না সম্পূর্ণ হয় না, সেই রকম অহঙ্কারের পরিচয়ের পরেই নানুঘ যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তাহার অস্তরায়ার সত্য ঈশ্বরত্ব। জীব একবার আপনার এই ভাগবত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে আর তাহার অহঙ্কারের প্রয়োজন নাই। কিন্তু অহঙ্কার লোপ পাইলে ব্যক্তিত্ব লোপ পায় না, তখনও থাকে একটা বিশেষ কেন্দ্র, তখনও থাকে এক রকম অহং কিন্তু সে অহং হইতেছে সোহং, সে কেন্দ্র বিশেষ হইয়াও সকল, সে ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইলেও বিশ্ব-তন্ত্র। সে যখন নিজের শক্তিতে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই সব করিতেছে তখন বিশ্বশক্তিকে বিশ্বইচ্ছাকেই পূরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহারই অনুগমন করিতেছে—কারণ সেখানে ব্যক্তি ও বিশ্ব এক, দৈব ও পুরুষকার অভিনু।

আত্মসমর্পণের ইহাই শেষ কথা। অহঙ্কার বুদ্ধির রাজসিক প্রেরণাকে নিস্তব্ধ করিতে হইবে, আবার সেই সঙ্গে তামসিক নিশ্চেষ্টতাকেও ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। আমি না করিলে কিছুই হইবে না,

আর আমার কিছু করার দরকার নাই, ভগবানই সব করিয়া দিবেন—
 এই দুই অতিনাত্রাকে এড়াইয়া সাধক এক মধ্যের পথ খুঁজিয়া নইবেন।
 ভগবানে তিনি সব সমর্পণ করিবেন, অর্থাৎ বোধ করিবেন তাঁহার মধ্যে
 সব কর্ম করিতেছে এক অপূর্ব শক্তি, অদ্বিতীয় চেতনা যাহা বিশ্বকে ধারণ
 করিয়া আছে, তিনি ষষ্ঠ, প্রণালী মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া সে ভগবান
 যে কোন স্তরের জগতের লোক, তাঁহার সহিত তোমার সংস্রব নাই এমন
 নয়। তুমি অসহায় জড় পদার্থ তাহাও নয়। না—তুমিই যে ভগবান—
 তোমার প্রকৃত তুমি, তোমার অন্তরায়, তোমার সংপুরুষ তাহাই যে
 ভগবান, ভগবানের এক ইচ্ছাশক্তি, এক তপঃপ্রভাব।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য

ইউরোপে আছে রাষ্ট্রের প্রভুত্ব অত্যাচার, ভারতে আছে সনাতনের প্রভুত্ব অত্যাচার। গোষ্ঠীর এই উভয়বিধ কবল হইতেই মানুষের ব্যক্তিত্বকে উদ্ধার করিতে হইবে। গোষ্ঠী ছাড়া সমষ্টিরও প্রভুত্ব অত্যাচার আছে, তাহা হইতেও মানুষকে রক্ষা করিতে হইবে। সমষ্টি, গোষ্ঠী আর ব্যক্তি এই তিনটির বর্গ মানুষকে যুগপৎ পরিপূর্ণ করিয়া চলা প্রয়োজন, কিন্তু কোনটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নয়, কাহাকেও একাধিপত্য দিয়া নয়। এই তিনটির মধ্যে আবার ব্যক্তির প্রতিই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। কারণ, ব্যক্তিই হইতেছে অপর দুইটির প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি যেখানে সজীব মহনীয় গোষ্ঠীর সমষ্টির সজীবতা মহনীয়তা সেইখানেই সম্ভব। আর কার্যতঃ আমরা দেখি এই ব্যক্তিকেই যেন সমষ্টি ও গোষ্ঠী চিরদিন পদানত নিপীড়িত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে।

প্রথমতঃ গোষ্ঠীর কথা। গোষ্ঠীর যে প্রয়োজন যে দাবীই থাকুক না কেন তাহা সাময়িক, তাহা আপেক্ষিক। তাহার মূল্য কথিয়া দেখিতে হইবে ব্যক্তিরই কষ্টপাথরে। ব্যক্তিই হইতেছে ভিতরের চিরন্তন সত্য, তাহাকেই অনুসরণ করিয়া গোষ্ঠী চলিয়াছে। ব্যক্তির চেতনা, তাহার আধ্যাত্মিক বিবর্তন যেন চলিয়াছে, সেই অনুযায়ী বাহিরের প্রতিষ্ঠানও নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। তাই দেখি যুগে যুগে মানবের অন্তরাত্ম গোষ্ঠীর গণ্ডীকে ভাঙিতেছে, নুতন করিয়া গড়িতেছে—কিন্তু কোন একটির মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। এক যুগে মানুষের এই গোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠান ছিল তাহার নিজ পরিজন, তাহার পর হইল বংশ বা কুল, ইহাও ভাঙিয়া পরে হইয়াছে

দেশ। প্রথমে family, পরে clan বা tribe, শেষে country. এই দেশের পরেও বর্তমানে জাগিতেছে একটা মহাদেশের গোষ্ঠী বাহাকে বলা হইতেছে empire। দেশের পরে আছে বিশ্বমানব লইয়া যে গোষ্ঠী অথবা সমষ্টি। কিন্তু এই সকল আরতন ব্যক্তিরই অন্তরায়ের উদারতর মুক্ততর লীলার জন্য ক্রমবর্ধমান পরিধি, এসকলের প্রাপ্তপ্রতিষ্ঠা প্রথমে হয় ব্যক্তিরই অন্তরে, সেখানেই প্রথমে জাগ্রত হইয়া পরে বাহিরে প্রকটিত স্থাপিত হয়।

কিন্তু তবুও কেমন আগাদের নোহ, বাহিরের বৃহত্তর আকারটি দেখিয়াই আমরা ভুলিয়া যাই যে অন্তরেরও গভীরতর কিছু মহত্ব থাকিতে পারে, তাই ব্যষ্টিকে আহ্বান করি অকুণ্ঠিতচিত্তে নিঃশেষভাবে আপনাকে গোষ্ঠীর কাছে বলি দিয়া চলিতে। আজ যেমন বলা হইতেছে দেশই সব, স্বদেশ ব্যতীত ব্যক্তির নিজস্ব কোন সার্থকতা নাই। একদিন সেই রকম কুলধর্মকেই এই আসন দেওয়া হইয়াছিল। আবার ভবিষ্যতে এমনও হইতে পারে যখন দেশকে ছাড়িয়া বৃহত্তর সাম্রাজ্যেরই কাছে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিতে মানুষের ডাক পড়িবে। অথবা বিশ্ব-মানবের সাথে ব্যক্তিমানবকে আপন সম্মুখি মিলাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই সকল উদাহরণের মধ্যে আমরা কি দেখিতেছি না, সকল রকম গোষ্ঠী-ধর্মই হইতেছে যুগ-ধর্ম—বিশেষ দেশ কালের জন্য আবশ্যিক ও অলঙ্ঘনীয় কিন্তু তাহা সনাতন নহে, সনাতন হইতেছে এই ব্যষ্টি? যুগ-ধর্মের বিপর্যয় ঘটিয়াছে তখনই যখন আমরা চাহিয়াছি ব্যক্তিকে ধর্ম করিয়া, পিষিয়া ফেলিয়া তৎপরিবর্তে ব্যক্তির বাহিরের ক্রীড়া-ভূমিকে, আরতনকে অচল সনাতন আদর্শ করিয়া তুলিয়াছি।

কারণ এইটুকু ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন যে ব্যষ্টিই হইতেছে সৃষ্টির কেন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডচক্রের নাভিস্থল। জীবাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া ভগবান আপনাকে নিত্য সৃজন করিয়া চলিয়াছেন। যে প্রতিভা যে তপো-

দেবজন্ম

বলে জগতে নব নব বিকাশ সম্ভব হইতেছে তাহার উৎস এই ব্যক্তির অন্তরাঙ্গায়—এখানেই শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, এখান হইতেই চারিদিকে বিচছুরিত হইয়া পড়িতেছে। আমরা একথা বলি না গোপ্তির কোন আত্মা নাই, ব্যক্তির মতন তাহার মধ্যে একটা জীব নাই। গোপ্তি শুধু কতকগুলি পদার্থের সমবায়, ব্যক্তির বিচরণের জন্য একটা জড়ক্ষেত্র মাত্র—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। ব্যক্তির ন্যায়, গোপ্তিরও আছে একটা অন্তরাঙ্গা। দেশ শুধু জমি নয়, দেশেরও আছে একটা নিগূঢ় বৃহত্তর জীবাত্মা। দেশের সকল ঘটনা সকল অবস্থা সকল বিবর্তনের মধ্যে, এমন কি ব্যক্তি বিশেষের চেতনাটির মধ্যে এই দেশ-আত্মারই অঙ্গসঞ্চালন কুটিয়া উঠিতেছে—ইহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তবুও পার্থক্য আছে। গোপ্তির আত্মায় যে চেতনা তাহা স্বভাবতঃই একটা “অচেতনা” (Inconscient)—অচেতন না হইলেও তাহা অন্ধ মুক আপনহারা, তাহা প্রাকৃত শক্তির চেতনা। ব্যক্তিরই মধ্যে তাহা জাগ্রত চেতনার পরিবর্তিত হইতেছে, সেখানেই সে ভাষা পাইতেছে, চক্ষুগ্রাহন হইতেছে, আপনাকে ফিরিয়া পাইতেছে, নব নব সৃষ্টির সান্নিধ্য পাইতেছে। এই সত্যকেই লক্ষ্য করিয়া গীতায় ভগবান বলিতেছেন আমি যুগে যুগে মানুষী তনু গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হই। নব নব ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবানকে ব্যক্তি বিশেষ হইয়াই আবির্ভূত হইতে হয়—গোপ্তিসম্ভাও সেই রকম আপনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যক্তিসম্ভার মধ্যেই বিগ্রহান্বিত হইয়া উঠে।

ব্যক্তির মধ্য দিয়া অজ্ঞানশক্তি সঞ্জন হইতেছে, সঞ্জন যাহা তাহা আবার পরাজ্ঞানে জাগ্রত হইতে চলিয়াছে। সৃষ্টিবিবর্তনের ইহাই মূল কথা। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে যে বস্তু খর্ব করিতে চায় তাহা সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করিতে চায়—আর যাহা কিছু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় তাহাই জগতের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর।

তাই গোপ্ত্রির বন্ধন ব্যক্তির পক্ষে যাহাতে নোহপিপ্তর না হইয়া উঠে সে জন্য সর্বদা সাবধান থাকা আমাদের কর্তব্য।

এখন গোপ্ত্রি সম্বন্ধে আমরা যে সব কথা বলিয়াছি সমষ্টি সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। বিশেষতঃ আজকালের যুগে যখন আমরা সমগ্র মানবজাতির একতা সম্পাদনের জন্য এতখানি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছি, আমাদের মুখে নিরন্তর যখন লাগিয়া আছে সাম্যমৈত্রীর কথা তখন আমাদের পক্ষে সমষ্টির আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানে চলা উচিত। মানবজাতি এক বলিয়া, সকল মানুষকে যেন একাকার করিয়া না ফেলি। সকলের সমান অধিকার, সমান কর্তব্য, দেশ জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান স্তরে—একথার অর্থ যেন না হয় সকলকে এক ছাঁচে ঢালিয়া পিটিয়া গড়িতে হইবে, সকলেরই হইবে একই ধরণ ধারণ, একই অশন বসন ভূষণ, একই ধর্ম, একই কল্ম। না, তাহা নয়; প্রত্যেক মানুষের অন্তরাত্ম আপনাবৈশিষ্ট্য লইয়া, আপনাবৈশিষ্ট্য পথে আপনাবৈশিষ্ট্য ভঙ্গিয়া জাগিয়া বাড়াইয়া উঠিবে। সকল ব্যক্তিকে পিষিয়া সমান করিয়া নয়, প্রত্যেককে ছাড়িয়া মুক্তভাবে চলিতে দিলেই সকলে আসিয়া পৌঁছিতে একটা যথার্থ সময়ের সামঞ্জস্যের ঐক্যের ক্ষেত্রে। মৃত্যুর জড়তার মধ্যে নয়, জীবনের সজীবতার মধ্যে যদি মানবজাতিকে এক করিয়া ধরিতে চাও তবে ব্যক্তিকে তাহার নিজেরই অন্তর্ব্যাপী পুরুষের ইচ্ছায় চলিতে দিতে হইবে। সমগ্র মানবজাতি বা বিশ্বের মুক্তি সিদ্ধি সার্থকতা এই ব্যক্তিরই মুক্তিতে সিদ্ধিতে সার্থকতার।

ভারতে নোব্লেসের আদর্শ এই মহাসত্যকেই ধরিয়াছে। ইহারই আলোকে সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনা, মানুষের সমস্ত জাগতিক চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আজকার দিনে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পীড়নে মানুষের আত্মা যখন জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, মানুষ যখন চাহিতেছে তাহার জন্য আর একটা বৃহত্তর ক্ষেত্র—কেহ

দেবজন্ম

নির্দেশ করিতেছে সাম্রাজ্য, কেহ বা বিশ্বমানব তখন এই সত্যটির উপর আবার বিশেষরূপে ধ্যান দিবার সময় আসিয়াছে। মানুষের পূর্ণতর উদারতর সত্তা, তাহার পারিপার্শ্বিকের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে না—উহা নির্ভর করে তাহার অন্তরায়ার স্বাধীন গতির উপর—আত্মানান্ধ কল্পনায়—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য।

তবুও আর একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। যখন আমরা এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর এতখানি জোর দিতেছি তাহা দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না আমরা ঠিক ভারতের প্রাচীন নোক্ষবাদটি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন কি আমরা ইউরোপে যাহা individualistic মতবাদ বলিয়া আজকাল প্রচারিত তাহাও প্রচার করিতেছি না। এই উভয় মতবাদই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর সকল জোর দিয়াছে, কিন্তু উভয়েরই দোষ এইখানে যে তাহাদের প্রতিষ্ঠা ব্যক্তির অহঙ্কারের উপর—একটি সাম্প্রদায়িক আর একটি রাজসিক অহঙ্কার, কিন্তু দুইই অহঙ্কার। এই জন্যই ভারতীয় নোক্ষবাদ একান্ত আত্ম-সর্বস্ব, প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করে তাহারই আত্মা এক মাত্র সত্য, উহা ছাড়া আর যাহা কিছু তাহা বাহিরের, সে সব মায়া—তাহার মুক্তিটুকু হইলেই সব হইল। তাহারও মুক্তি, জগতেরও মুক্তি। আর ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফল ঘেঘ, সংঘর্ষ—বেশীর ভাগই ইহা প্রতিবাদের তত্ত্ব, বেশীর ভাগই সে চাহিয়াছে ভাদিয়া ফেলিতে—protestant ও negative—গড়িয়া তুলে, সামঞ্জস্য করা তাহার ধাতুতে নাই।

কিন্তু আমরা যে ব্যক্তিস্বত্বের কথা বলিতেছি তাহা হইতেছে ব্যক্তির মধ্যে ভাগবত সত্তা, সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ—জ্ঞানের স্বরূপই যেখানে হইতেছে তপঃ, তপঃশক্তির স্বরূপই হইতেছে যেখানে জ্ঞান—সেই মৌলিক অবলম্বন বাহার উপর ভর করিয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্য কুটিয়া উঠিয়াছে।

এই ভাগবত ব্যক্তিস্বের ধর্মই হইতেছে বহুকে একের মধ্যে ধরিয়া রাখা, এককে প্রতিষ্ঠা করিয়া নানাকে ফলাইয়া তুলনা, ভেদের মধ্যে সাম্যকে আঁট রাখা। সুতরাং এই ব্যক্তিস্ব যদি ধরিতে পারি, ইহারই পূর্ণস্বাতন্ত্র্যে উদার অভিব্যক্তিতে জাগ্রত হই তবে ব্যক্তির ধর্মে গোপ্তির ও সমষ্টির যে বিশেষ ধর্ম যে বিশেষ দাবী তাহারা সব যুগপৎ সহজ ও অব্যর্থভাবে চরিতার্থ হইবে।

আমার মধ্যে আমার এই ভাগবত পুরুষ একান্ত আমারই নহেন, তিনি সকলের, সমগ্রের—তিনি বিশ্বের, সমষ্টির, গোপ্তির, প্রত্যেকের। আমার মধ্যে তিনি যখন মুক্ত জাগ্রত সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তখন তাহার অর্থ বিশ্ব, সমষ্টি, গোপ্তি, প্রত্যেকেই আমার মধ্যে মুক্ত জাগ্রত সত্য হইয়া উঠিয়াছে। আর আমার অন্তরে যদি ইহার সিদ্ধ হইয়া থাকে তবে আমার কর্মের নৈসর্গিক গতিই হইবে বাহিরে, স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে ইহাদিগকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে। স্বরাট আমার জীবাত্মা আপন সাম্রাজ্যের এই সকল বিভিন্ন রাজ্যকে পূর্ণ সমৃদ্ধ ঐক্যে বিধৃত করিয়াই তুলিবে। তখন গোপ্তি বা সমষ্টি বা অপরাপর ব্যক্তি-সত্তা কোন ব্যক্তির বন্ধন হইবে না, তাহা উহার বিভূতি হইয়া উঠিবে। আর যুগধর্ম আমাদেরকে যে বিশেষ আয়তনেই স্থাপিত করুক না কেন, আমার এই ব্যক্তিগত মুক্তির পূর্ণতার ফলে যুগধর্মের কর্ম সম্পাদন করিয়াও আমাদের কর্মযুগকে ছাড়াইয়া চলিবে, সে কর্ম যুগের প্রকৃত গোপ্তিধর্ম ত পরিপূর্ণ হইবেই কিন্তু তাহাতে গোপ্তি ছাড়াইয়া সমষ্টিও চরিতার্থ হইবে, বিশ্বের প্রত্যেকে তাহাতে সার্থকতা পাইবে।

আমাদের লক্ষ্য মানবজাতিকে এই ভাগবত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে জাগরিত করা। সমাজ হউক দেশ হউক রাষ্ট্র হউক—বর্তমানে যে গোপ্তিধর্ম প্রয়োজন তাহা আমরা ধ্বংস করিতে চাহিনা, তাহাদের সেবা আমাদের করিতে হইবে, বর্তমানে তাহার প্রয়োজন আছে। আমরা চাই সমাজকে

দেবজন্ম

রাষ্ট্রকে নেশনকে নূতন মস্ত্রে, নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে—তাহার মূল কথা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য। তবেই না বৈচিত্র্যের, নব নব জ্ঞানের শক্তির সহস্রধারা খুলিয়া যাইবে, যন্ত্রের পরিবর্তে—পরিবর্তে না হউক যন্ত্রের অন্তরালে যন্ত্রী আসন পাইবে, উহাকে চালাইয়া লইবে, নিয়ন্ত্রিত করিবে, প্রয়োজন হইলে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবে।

কর্ম ও যোগ

সাধনা কেন? ভগবানের ইচ্ছা ত নিষ্কল হয় না। তিনি যাহা চাহিবেন তাহা হইবেই, তিনি যাহা চাহেন না শত মাথা কুটিলেও তাহা হইবে না। আমার মধ্যে যদি কিছু সার পদার্থ থাকে তবে তাহা ফুটিয়া বাহির হইবেই, জগতে আমার যদি কিছু করিবার থাকে, তবে তাহা করিবই। সে জন্য এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, এত গলদঘর্ষণ কেন? নেপোলিয়ন বা আলেকসান্দর আমাদের মত কোন কৃচ্ছ সাধনা করিয়াছেন? তাঁহাদের প্রতিভা একটা নৈসর্গিক শক্তির জোরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, চেষ্টা করিয়া তাঁহারা শক্তি আহরণ করিয়াছেন কি? শক্তি অর্থাৎ অন্তরের শক্তি, বাহিরের উপকরণ নয়। স্বীকার করিতে প্রস্তুত নেপোলিয়ন বা আলেকসান্দরেরও যে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ চলে নাই তাহা নয়, তাঁহাদেরও একরকম সাধনা করিতে হইয়াছে। শুধু কর্মী কেন, কবি—যাঁহারা জন্মসিদ্ধ বলিয়া বিশেষরূপে পরিচিত, তাঁহাদেরও সাধনা আছে, কোন কবি যে ইহার হাত এড়াইতে পারিয়াছেন এমন বোধ হয় না। ঋতুসংহারের কালিদাস কি করিয়া শকুন্তলার কালিদাস হইলেন, ‘ভিনস্ ও আদোনিস’-এর শেক্সপীয়র কি করিয়া হ্যামলেটের শেক্সপীয়র হইলেন কবি-হৃদয়ের সে ইতিবৃত্ত জানা না থাকিলেও আমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে আমাদের মতন যোগ সাধনা তাঁহারা করিয়াছেন কি? শক্তির জন্য তাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্ব লইয়া মাথা বাগাইয়াছেন কি? জগৎ হইতে যাঁহারা সরিয়া পড়িতে চাহেন, পারলৌকিক ভগবানের বা নির্বাকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে যোগপন্থার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে

দেবজন্ম

পারি—সামু যে যোগী হইবেন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু আমরা, যাহারা কন্নী বাহাদের লক্ষ্য নেপোলিয়ন বা' শেক্সপীরের মতন একটা ঐহিক কর্ম সম্পাদন করা, তাহাদের পক্ষে অধ্যাত্মচর্চা, যোগসাধনা কোন প্রয়োজনে লাগিবে? কোন কর্মের প্রেরণা ও তাহা উদ্‌যাপনের জন্য প্রতিভা যদি ভিতরে থাকে—এ দুটি জিনিষ জন্মগত, ইহারা না থাকিলে আহরণ করিবার বস্তু নয়—এই জিনিষ দুটি যদি থাকে তবে জীবনে ও কর্মের মধ্যে—তাহাদের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে মাত্র; সেজন্য একটা চেষ্টা, একটা চর্চা চলিতে থাকে বটে কিন্তু শক্তিবিকাশের তাহা কারণ নয়, আনুষঙ্গিক অবস্থা (condition) মাত্র। আর সে চেষ্টা সে চর্চা যে-বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য সেই বিষয়টি লইয়াই, কিন্তু বিষয়াতিরিক্ত সুদূর অধ্যাত্ম-রাজ্যে উঠাও হইয়া যাইবার সার্থকতা কি?

স্বীকার করিলাম কন্নী নেপোলিয়ন বা কবি শেক্সপীর যোগ সাধনা করেন নাই। কিন্তু অর্জুন ত করিয়াছেন, শিবাজী করিয়াছেন। কবিদিগের মধ্যেও কি কেহ করেন নাই? ব্যাস বাল্মীকি ছিলেন ঋষি মহাযোগী। অবর্তীচীন কালেও দেখিতে পাই কবি তুলসীদাস চণ্ডীদাস ছিলেন পরম সাধক। কিন্তু তুনি আবার বলিতে পার, ভারতীয় কন্নীরা প্রাক্কশই একাধারে যোগী ও কন্নী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কি ইতর বিশেষ হইয়াছে? তুলসীদাস যোগী হইয়াও শেক্সপীর অপেক্ষা বড় কবি হইতে পারেন নাই। কন্নী হিসাবে প্রাকৃত স্বভাব প্রণোদিত নেপোলিয়ন বা সীজর আন্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন যোগী শিবাজী অপেক্ষা কি নিম্নতর স্তরে?

প্রশ্নটি তবে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। মোট জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কর্মের উপর যোগের প্রভাব কি? আমি দেশকে স্বাধীন করিতে চাই, আমি কবি হইতে চাই—অথবা 'চাই' না বলিয়া, বলিতে পারি এদুটি প্রেরণা আমার মধ্যে আছে ও কুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—

এখন যোগ সাধনা এ বিষয়ে আমাদের কি বিশেষ সাহায্য করিবে, আর সকলে সহজাত শক্তির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশেই যাহা করিতে পারিয়াছে আমাদের তাহার জন্য যোগের আশ্রয় নহিতে হইবে কেন? অবশ্য এমন হইতে পারে আমি দুইটি জিনিষকেই চাই, চাই কর্মেরও আনন্দ যোগেরও আনন্দ, আমি যুগপৎ হইব কর্মী ও যোগী। কিন্তু ইহা পৃথক কথা। আমরা জানিতে চাই কর্মেরই জন্য যোগ কেন ও কি হিসাবে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কর্মী দুই প্রকারের—সজ্ঞান কর্মী আর অজ্ঞান কর্মী, যাঁহার মধ্যে ভগবান জাগ্রত ভাবে কাজ করিতেছেন আর ঘাঁহার মধ্যে তিনি লুকাইয়া যবনিকার ভিতর হইতে কাজ করিতেছেন। ভগবানের হাতে সকলেই যন্ত্র—তবে কেহ একখাটি জানে বোধ করে, আর কেহ তাহা জানে না বোধ করে না। গীতার বাক্যে একজন হইতেছেন ‘স্থিতপ্রজ্ঞ’ আর একজন হইতেছেন ‘প্রমত্ত’। ভগবানের শক্তি দুই জনের মধ্যেই সমান বেগে খেলিতে পারে, এমন কি প্রমত্ত যে সে-ই বৃহত্তর শক্তির আধার হইতে পারে। কিন্তু দুইজনের কর্মের ধরণ ভিন্ন। বিভিন্ন, ফলও পৃথক। স্থিতপ্রজ্ঞের কর্মের মধ্যে আছে কেমন দেবভাব, একটা শান্তি ও শক্তি জ্যোতিঃ। প্রমত্তের কর্মের মধ্যে আছে চাঞ্চল্য মলিনতা। প্রথমোক্তের শক্তি সংহত সংযত, কোথাও কিছু অপচয় অনাবশ্যক নয় নাই, লক্ষ্যে ও উপায়ের মধ্যে আছে পূর্ণ সামঞ্জস্য। শেষোক্তের শক্তি বিক্ষিপ্ত, এমন কি এ-ধরণের ঘাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্মবীর তাঁহাদিগের মধ্যেও দেখি কত অবাস্তুর অপ্রয়োজন ব্যয়। সমস্ত শক্তির একটা অংশমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হইয়াছে মাত্র। একজনের কর্মে অনেক ‘বিকর্ষ’ মিশিয়া থাকে এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ও ফল ভোগ করিতে হয়। আর একজনের কর্মে বিকর্ষ কিছু নাই, অন্তরে তাহার আছে কর্মহীনতা—‘অকর্ষ’—তাই সেখানে প্রতিক্রিয়া নাই, সেখানে কোন

দেবজন্ম

দাগ বসে না, তাঁহাকে ফলভোগী হইতে হয় না। মত্ত কৰ্ম্মীর প্রয়োজন আছে, সময়ের যুগধর্ম্মের আবশ্যকতা অনুসারে ভগবানকে আশ্রয়ী বিভূতিও আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইতে হয়—কিন্তু সেই সঙ্গে আশ্রয়ী ভাবের সমস্ত আনুষঙ্গিক ময়লা আবর্জনা কত অল্পতা খণ্ডতাকেও তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে হয়। প্রমত্ত কৰ্ম্মীর মধ্য দিয়াও ভগবান তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লন, যন্ত্র যেমনই হউক সেই পরম কুশলী যন্ত্রী তাহাকে ব্যবহার করিতে জানেন। উদ্দেশ্য তিনি সিদ্ধ করেন কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সাথে যন্ত্রটিকেও ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কাজ যতক্ষণ ততক্ষণ ইহাকে কালপুরুষ মাখায় করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, কাজ হইয়া গেলেই পদতলে ফেলিয়া চূর্ণ করিয়াছেন। সীজের বিরাট বিভূতি কিন্তু তাহার পরিণাম অপমৃত্যু; আলেকসন্দরের অকালমৃত্যু আর নেপোলিয়নের সেন্ট হেলেনা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের, ভীষ্মের নিকটে প্রকৃতি তাঁহার এই অন্তিম অব্যর্থ দাবীটি আদায় করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল ইচ্ছামৃত্যু—যোগেনাস্তে তনুত্যাগ্নাং।

অপ্রমত্ত যে কৰ্ম্মী তাহার কৰ্ম্ম স্তূপের ভবিষ্যতেরও সফলতার সহিত সংগ্রথিত, অনন্ত কালের কি একটা সার্থকতা কল্পে নিয়োজিত, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের মধ্যে যে আবেগ বহিয়া চলিয়াছে তাঁহার কৰ্ম্মশক্তি সেই মৌলিক আবেগকেই উপচিত করিয়া চলিয়াছে, সজ্ঞানে তাহার সহায় হইয়া তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রমত্ত কৰ্ম্মী বিশেষভাবে হইতেছেন বর্তমানেরই, সাময়িক অভাব পূরণার্থই তাঁহার আবির্ভাব—সনাতনের উপর তাঁহার প্রভাব গৌণ হিসাবে মাত্র। আলেকসন্দরের গ্রীস কি দিয়াছে, কোথায় এখন? কোথায় সীজরের রোম? কোথায় নেপোলিয়নের ফরাসীদেশ? জগতের ভাঙারে ইহাদের দান এখনও যে নির্দেশ করা যায় না তাহা নয়। কিন্তু সে সব কত নীচে পড়িয়া গিয়াছে, দেখা যায় কি না যায়। তুলনা কর ভারত-

বর্ষের সাথে—জীর্ণ পতিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জাতি হইয়াও এখনও তাহার মধ্যে কি অপরূপ প্রতিভা খেলিতেছে! কেন? কারণ, ভারতের কর্মগুরু ছিলেন রাম, কৃষ্ণ, অর্জুন, শিবাজী। প্রমত্তের শক্তি একদিকে যেমন বিপুল কর্মজাল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে সে-শক্তি নিজেকেই নিজে গ্রাস করিতেছে। কিন্তু স্থিতবীর স্থির-প্রজ্ঞের কর্ম আপনার উপর ফিরিয়া চাপিয়া পড়ে না, সে চলিয়াছে চিরদিন সমুখে। য্রোতস্থিনীর মত অনন্তের বক্ষে নিশিতে, সে যতটুকু করে তাহাতেই তাহার সার্থকতা, তাহার স্বংস নাই—স্বল্পমপি অস্যা ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভরাৎ।

২

যোগীর লক্ষ্য হইতেছে প্রকৃতির উপর আপন ঈশ্বরত্ব স্থাপন—প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করা। সাধারণ কর্মী, তিনি যত বড় বিভূতিই হউন না কেন তিনি কৌশলে প্রকৃতির নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া থাকেন, আর বড় জোর না হয় প্রকৃতিকে দমন করিয়া জোর করিয়া বশীভূত করেন। কিন্তু তবুও তিনি মূলতঃ প্রকৃতিরই দাস, প্রকৃতির নিয়মকে একেবারে উল্টাইয়া কেলিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। প্রকৃতির ধর্মকে তাঁহার অনুসরণ করিতেই হয়, অতিমাত্র জোরজবরদস্তি করিলে আপাততঃ বাহাই হউক না পরিণেমে প্রকৃতি তাহার পরিশোধ লইয়াই থাকে। যোগীর সাথে প্রকৃতির কিন্তু এই স্বন্দেহ কোন সম্বন্ধ নাই। যোগী প্রকৃতির উপরে উঠিয়া গিয়াছেন, সাধারণ প্রমত্ত কর্মীর মত তিনি প্রকৃতির কর্মশৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাই প্রকৃতি যোগীরই তপঃশক্তিকে স্বেচ্ছায় তদগতচিত্ত হইয়া অনুসরণ করিতেছে—বেদের কথায়, বধু যেমন চলিয়াছে পতিকে চাহিয়া। যোগী প্রকৃতিকে

দেবজন্ম

দিয়াছেন একটা উচ্চতর ধর্ম, তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন একটা মহীয়ান সভায়।

কর্মের সহিত যোগের সহজ সম্বন্ধটি আমরা সাধারণতঃ যে ধরিতে পারি না, তাহার কারণ যোগ অর্থ আমরা বুঝি ধর্মশালতা বা সাধুতা। কিন্তু যোগের আর সাধুতার মধ্যে কোন অদ্বাদ্বী সম্বন্ধ কিছু নাই। বরং সাধুতার সহিত যোগের একটা বিশেষ পার্থক্যই রহিয়া গিয়াছে। কারণ সাধুর লক্ষ্য প্রকৃতি জয় নহে, প্রকৃতিকে এড়াইয়া চলিয়া যাওয়া আর যতদিন এড়ান না যায় ততদিন প্রকৃতির ধর্মকেই মানিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া যতটুকু বা যতখানি কাজ করা যায় তাহা করা। সাধু যে মুক্তি পাইয়াছেন তাহা জ্ঞানে বুদ্ধিতে কিন্তু যোগী মুক্তি চাহেন তপঃ-শক্তিতে—প্রাণে, দেহে, কর্মের আয়তনে। অথবা আমরা বলিতে পারি যোগীর লক্ষ্য মোক্ষ নহে, তাঁহার লক্ষ্য হইতেছে সিদ্ধি।

কর্মী অপেক্ষা (অর্থাৎ অজ্ঞান বা প্রমত্ত কর্মী) বরং দেখি কবিরই একটা অন্তরের নিল রহিয়াছে যোগীর সাথে, সে কবি যতই ইহসর্বস্ব প্রাকৃত ভাবসম্পন্ন হউন না কেন। কারণ কর্মী যে-হিসাবে প্রমত্ত হইতে পারেন, কবি সে-হিসাবে প্রমত্ত হইয়া কবি হইতে পারেন না। কারণ কবির উৎস প্রকৃতির উপরে একটা লোকে, কবি সর্বদাই আপনাকে একটা উচ্চতর মহত্তর প্রেরণার কাছে ছাড়িয়া দিতেছেন, একটা সুগভীর শান্তি জ্যোতিঃ তপঃশক্তির জন্য তিনি সর্বদাই অপেক্ষা করিতেছেন। কর্মী প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া, এমন কি প্রকৃতির দাস হইয়া বিরাট কর্ম করিতে পারেন, কিন্তু কবিকে সেই রকম বিরাট মহান কাব্য সৃজন করিতে হইলে, প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যাইতেই হইবে—শব্দ অর্থ অনুভূতি লইয়া প্রকৃতির যে ভাগটি তাঁহার রাজ্য, সেটি যোগীর কাছে যেমন বিশ্বপ্রকৃতি আসিয়া ধরা দেয়, তেমনি ধরা না দিলে তাঁহার কাব্যসৃষ্টি যথার্থ কাব্যসৃষ্টি হয় না। নেপোলিয়নের

মধ্যে যে প্রমত্ততা সম্ভব হইয়াছে, শেক্সপীরের মধ্যে সে প্রমত্ততা সম্ভব হয় নাই। শেক্সপীর যোগী ছিলেন না, অথচ তাঁহার মধ্যে খেলিয়াছে যোগীমূলভ একটা স্থিতপ্রজ্ঞা, কাব্য বিষয় লইয়া যে প্রকৃতি তাহার উপর সহজ সম্পূর্ণ ঈশ্বরত্ব। তুলসীদাস কবি ছিলেন বটে কিন্তু কবি অপেক্ষা বেশীর ভাগ ছিলেন তিনি ধর্মপরায়ণ, সাধু—তাঁহার যোগ সাধনাকে তিনি এই সাধুত্বের অনুগত করিয়া চালাইয়াছেন। শেক্সপীর যোগী ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি। কিন্তু কবিত্বের সাধনা তাঁহাকে যোগীবৎই করিয়া তুলিয়াছে। তবুও এ কথাটি সত্য, কবিত্বের মধ্যে যে নিগূঢ় যোগসাধনা রহিয়াছে তাহা গোপন খণ্ড যোগসাধনা, পূর্ণ জাগ্রত আত্মপ্রতিষ্ঠা যোগসাধনা তাহা নয়।

এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব শক্তির স্বাভাবিক পরিস্ফুরণ আর যোগসাধনা এ দুইয়ের পার্থক্য কি? আমরা বলিয়া থাকি নেপোলিয়ন বা শেক্সপীরের মধ্যে শক্তির চলিয়াছিল একটা স্বাভাবিক বিকাশ। কিন্তু যোগও কিছু অস্বাভাবিক চেষ্টা বা কষ্টকল্পনা কিছু করে, এমন নয়। যোগের প্রয়াসও সহজ স্বাভাবিক, তবে তাহা একটু ভিন্ন প্রকারের স্বভাব। যখন আমরা বলি স্বভাবকে কাজ করিতে দাও, তাহার অর্থ নিজেই ছাড়িয়া দাও প্রকৃতির হাতে, প্রকৃতি অর্থাৎ জড় প্রকৃতি। শিক্ষা অর্থ বুঝি সহজাত প্রেরণা instinct যেমন চালায় সেই পথে চলিয়া, আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলা। রুসো (Rousseau) তাই কেবল চাহিয়াছেন natural man-টিকে উদ্ধার করিতে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ শিক্ষা দিয়াছেন আকাশ বাতাস নদী পর্বত গ্রহ নক্ষত্রের সহিত একপ্রাণ হইতে। কিন্তু এই যে natural man বা instinct-এর ক্ষেত্র তাহাই মানুষের সব স্বভাব বা গভীরতম প্রকৃতি নয়। মানুষের প্রতিষ্ঠা এইখানে বটে, তাহার সকল মহত্তম প্রেরণাই বোধ হয় এখানেই লুকাইয়া আছে—কিন্তু

দেবজন্ম

এসকলকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে কি ভাবে, তাহাদের চরম সার্থকতা পাইতে হইলে চলিবে কি ধরণে? ইহাই প্রশ্ন। আমরা বলি, সেজন্য যাইতে হইবে উৎসের কাছে, এই জড়প্রকৃতির মধ্যেই খুরিয়া ফিরিয়া চলা নয়, যাইতে হইবে একটা উর্দ্ধতর ক্ষেত্রে, এক জ্যোতির্গগ জগতে, যাহাই হইতেছে তপঃশক্তি বা অধ্যাত্ম সত্তা।

মানুষের মধ্যে আছে এই দুইটি রাজ্য, প্রাকৃত ও অধ্যাত্ম। একটি জড় আর একটি সচেতন, একটি সজ্ঞান আর একটি অজ্ঞান, একটি চলে আপনাকে চিনিয়া জানিয়া আর একটি চলে অন্ধভাবে আপনাকে না চিনিয়া না জানিয়া বা অস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়া—অথবা আমরা যেমন বলিয়াছি একটি স্থিতধী আর একটি প্রমত্ত—এই দুইটি শক্তি অধ্যাত্ম বা তপঃশক্তি আর প্রাকৃত প্রেরণা—যে একান্ত বিরুদ্ধ-বর্নের তাহা নয়। একটি আর একটিকে পূরণ করিয়া চলিয়াছে মাত্র। প্রকৃতির প্রেরণা যাহা চায়, আধ্যাত্মিক প্রেরণাও তাহাই চায় কিন্তু পূর্ণতর, স্পষ্টতর এবং ক্ষিপ্ততরভাবে। প্রাকৃত প্রেরণার হাতে মানুষকে ছাড়িয়া দাও, তাহার বিবর্তন চলিবেই, সে কিছু খানিয়া যাইবে না, তাহার অন্তরের ধ্বংসগুলি স্বল্পের সংঘর্ষের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে ফুটিয়াই উঠিবে। কিন্তু সে বিবর্তনের গতি অতি শিথিল অতি মৃদু—তাহাতে কত ভুল কত ভ্রান্তি, কত উদ্বান, কত পতন, শক্তির কত অপচার অনাচার। সম্যক জ্ঞানের অভাবে আত্ম-প্রভুত্বের বোধের অভাবে প্রকৃতি চলে অন্ধের মত হাতড়াইয়া, এদিকে ওদিকে বিপথে অপথে বিচরণ করিয়া। কিন্তু যোগশক্তি হইতেছে তপঃশক্তি অর্থাৎ শক্তি যখন জ্ঞানের আলোকে চক্ষুপ্রান, জ্ঞান যখন শক্তিকে বিচছুরিত করিতেছে। তখন অপচরের সম্ভাবনা আর থাকে না, অপ্রয়োজনের মধ্যে আর বৃথা সময়ক্ষেপ হয় না। বিবর্তন চলে দ্রুত গতিতে, মানুষ আপনার শক্তির সম্ভান পায়, শক্তিকে স্ফুট ও কর্ণপূর্ণ করিয়া তোলে এক অসামান্য অটুট স্বরান্বিত আবেগে।

যোগশক্তি আর কিছু নয়, তাহা হইতেছে সংহত একাত্ম প্রাকৃতশক্তি। প্রকৃতির শ্রুত কার্য্যপ্রণালীর মধ্য হইতে বৈজ্ঞানিক যেমন আবিষ্কার করিয়াছেন synthetic method, যোগীও তেমনি মানুষের কর্ম-জীবনকে গড়িবার জন্য পাইয়াছেন এক concentrated process আর ইহারই নাম যোগ।

সুতরাং মানুষকে যখন বলি প্রাকৃতিক স্বচ্ছন্দ গতি ছাড়িয়া যোগের কৃচ্ছ সাধনার আশ্রয় গ্রহণ কর, তখন তাহাকে বলি মাত্র—এই concentrated processটির আশ্রয় গ্রহণ কর, ইহাতে সময়ক্ষেপ হইবে অল্প, অপচয় হইবে অল্প, অথচ তোমার প্রকৃতি যাহা চায় তাহা পূর্ণ-তরভাবেই সংসিদ্ধ হইবে। প্রয়াসের পরিণতের মাত্রা (intensity) বাড়িয়া যাইতে পারে, বাড়িয়া যাইবেই—কিন্তু তাহা কি স্বভাব-বিরুদ্ধ? প্রয়াস বা চেষ্টা দুই রকমের—এক হইতেছে জোর করিয়া চেষ্টা আর এক হইতেছে সহজ চেষ্টা। জোর করিয়া যে চেষ্টা আমার বাসনার আবেগ বা ব্যক্তিগত শক্তির উপর নির্ভর করে—সে-চেষ্টার মধ্যে আছে একটা জ্বরদস্তি, ‘প্রমত্ত’ ভাব। এইটাই স্বভাবের বিরুদ্ধ—সাধারণতঃ আমরা এই চেষ্টাকেই চিনি। কিন্তু যোগীর চেষ্টা সত্তার সহজ বিস্তৃতি তপঃশক্তির ঋজু বিস্ফুরণ, অন্তরে অন্তরে এক শান্ত স্নিগ্ধতার উপরে তাহা দাঁড়াইয়া। ইহা প্রাকৃত স্বভাব নয়, ইহা হইতেছে ভাগবত স্বভাব। যোগ চাহে এই ভাগবত স্বভাবের এ দিব্য ভাবের চেষ্টা বা প্রয়াস। তাই কবিকেও যখন বলি যোগ সাধনা কর, তখন তাহাকে তাহার নিগূঢ় কবিত্বশক্তিকে প্রকৃষ্টভাবে ফুটাইয়া ভুলিবার পন্থাটাই নির্দেশ করি। সকল কবি সকল কর্মীর মধ্যে, বিশেষতঃ কাব্য-জগতে বা কর্মজগতে যাহারা এক একজন বিভূতি তাঁহাদের মধ্যে এই যোগশক্তি অর্থাৎ concentrated process of nature খেলিতেছে, তবে সে একটা আবরণের মধ্য দিয়া, কোথাও অজ্ঞানে,

দেবজন্ম

কোথাও অর্দ্ধজ্ঞানে। যোগশক্তি এই আবরণকে দূর করিয়া দেয়, অজ্ঞানে অর্থাৎ শক্তির একেবারে কেন্দ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষের বিশেষ কর্ণটিকে অন্ততঃ পূর্ণ সিদ্ধিতে ভরিয়া দেয়।

৩

মানুষ সাধারণতঃ কর্ত্ত্ব করে প্রাণের উদ্ভেজনা। কিন্তু শুধুই এই প্রাণের উদ্ভেজনা কিংবা instinct-এর প্রেরণা তাহার কর্ত্ত্বের উৎস বা নিয়ন্তা এমন বলিলে মানুষ আর পশুর মধ্যে সকল পার্থক্য একেবারে অপলাপ করা হয়। কারণ সাধারণ মানুষেরও আছে একটা বুদ্ধি, বিচারশক্তি এবং সেই সঙ্গে অল্পবিস্তর এক ইচ্ছাশক্তি। সুতরাং কোন মানুষই তাহার সহজাত বা প্রকৃতিদত্ত আনুকের স্বভাবকে অনুসরণ করিয়া চলে না, চলিতে পারে না। বাছাই যাচাই করিয়া, লক্ষ্যের সহিত উপায়ের মিল সামঞ্জস্য রাখিয়া, উপকরণের ও সময়ের অপচয় যথাসাধ্য নিবারণ করিয়াই সকল কার্য সে সুসম্পন্ন করিতে চায়। সাধারণ লোকের মধ্যেই এমন কর্ত্ত্বীর যথেষ্ট উদাহরণ আমরা পাই যাহারা আত্মশক্তি বিকাশের জন্য অথবা কর্ত্ত্ব উদ্‌যাপনের জন্য এই রকম একটা concentrated processকেই অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ শিক্ষা বা culture এই প্রণালীরই একটা রূপ। তবে যোগের ও শিক্ষার পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য এইখানে যে শিক্ষা মানুষকে তাহার বুদ্ধিশক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে কিন্তু যোগ আরও উপরে চলিয়া গিয়াছে, সে মানুষকে গঠিত পরিচালিত করিতে চাহিতেছে চিত্তশক্তির দ্বারা। এই চিত্তশক্তি মানুষের আরও অন্তরের বস্তু—বুদ্ধিশক্তি অপেক্ষা আরও গভীরতর, উদারতর, সুতরাং আরও সত্যতর, আরও শক্তিমান। বুদ্ধিশক্তি

হইতেছে চিৎশক্তির দুই একটা বিক্ষিপ্ত বা বিকৃত রশ্মি মাত্র। শুধু বুদ্ধির বলেই যদি কর্মকে গঠিত করিতে চাই তবে তাহার মধ্যেও অনেক ভুল অনেক ভ্রান্তি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। প্রাকৃত শক্তি বরং নির্ভুল না হউক, নিরর্থক হইবার নয়—সে অন্ধ, অজ্ঞান তাহার গতি শুধু মন্তর, সে চলিয়াছে টলিয়া টলিয়া, পরিশেষে কিন্তু সে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতেই পারে। কারণ, প্রাকৃতশক্তি চিৎশক্তিরই উল্টা দিক বা ছায়া—চিৎশক্তিই গুপ্তভাবে তাহাকে চালাইয়া লইয়াছে কিন্তু মানবীয় বুদ্ধিশক্তি হইতেছে কাণা, অর্দ্ধজ্ঞানী—ভুলপথে উঠিলেও অহঙ্কার তাহাকে ভুল স্বীকার করিতে দেয় না, সত্য বলিয়াই সে-পথে সে চলিতে থাকে। ঠিক পথেও চলিবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সে চলে যেন স্তিমিতালোকে—জ্ঞানের শক্তির উৎস-স্থানটি সে ধরিতে পারি নাই।

যোগের concentrated process হইতেছে আত্মার পূর্ণ বিকশিত শক্তিরলীলাপ্রকাশ, তাহা হইতেছে ঐশ্বরিক প্রতিভার আবেগ। বুদ্ধি দেখে আমি কি চাই, আমি কি হইতে পারি, শুধু চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া কতখানি কোন্ রকমে সম্ভব তাহা স্থির করা। কিন্তু যোগ দেখে ভগবান কি চাহেন, তাই শক্তি সেখানে আমার ব্যক্তিগত শক্তির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকে না, অবস্থার দ্বারা আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখে না। মানুষের মধ্যে সে খুলিয়া দেয় একটা অকুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার। সে শক্তি ভাগবত ভাব (Idea)-কে পরিপূর্ণ করিতে চলিয়াছে বলিয়া তাহার সীমাও নাই, ব্যর্থতাও নাই—তাহার গতি যেমন ধ্বজু ও ক্ষিপ্ত তেমনি তাহা আবার উদার, বহু বিচিত্র।

কারণ, যোগ যে শুধু কর্মকে বিশুদ্ধভাবে ক্ষিপ্তগতিতে স্ফুস্পন্ন করে তাহা নয়, কর্মের পরিধিকেও সে বিস্তৃত করিয়া তোলে। প্রাকৃত প্রেরণা বা instinct কিনা বুদ্ধির জোরে মানুষ যাহা করে বা করিতে পারে, তাহা মানুষের সমগ্র সত্তার একটা দিক বা অংশমাত্র। মানুষের

দেবজন্ম

যে ভাগটি আপাততঃ বাহিরে দেখা দিয়াছে, যে কর্ত্তপ্রেরণার দ্বারা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাকেই অতিনাত্র বা একনাত্র করিয়া লইয়া উহার। চলে। যোগ কিন্তু কত অজানা শক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। মানুষের বুদ্ধিশক্তি খেলে instinctকেই লইয়া, প্রাণের মধ্যে যে আবেগটি খেলিতেছে তাহাকেই নাজিয়া ঘষিয়া তুলিতে তাহার চেষ্টা। Instinct-ও হইতেছে আমার চিন্তের কয়েকটা আপাত দৃশ্যমান তরঙ্গ। কিন্তু এই instinctএর নীচে পড়িয়া আছে একটা বিরাট অজ্ঞাত সাগর, একটা বৃহৎ বিপুল সত্তা, তাহার মধ্যে আরও কত প্রেরণা কত আবেগ লুকাইয়া আছে। যোগশক্তি মানুষের এই অবচেতনার (inconscious) জগতে স্রুপ্ত বৃত্তি সব জাগরিত করিয়া ধরে; পরাচেতনার (super-conscious), তপঃশক্তির চাপে নিভৃত প্রতিভা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোলে। সাধারণভাবে প্রাকৃত প্রেরণায় বা বুদ্ধির চেষ্টায় চলিলে আমি হয়ত হইতাম শুধু কবি অথবা শুধু দার্শনিক কিম্বা বোদ্ধা। কিন্তু যোগশক্তির স্বাভাবিক গতিই হইতেছে মানুষের মধ্যে সর্ববিধ প্রেরণাই অল্পবিস্তর ফুটাইয়া তোলা। সকল বিষয়ে সে যদি মানুষকে পূর্ণতাও না দিতে পারে, তবে অন্ততঃ সকল বিষয়ে সে জন্নাইয়া দেয় একটা রসানুভূতি, ঝুলিয়া দেয় একটা সর্বতোমুখী সহজ দৃষ্টি। কারণ জগতে প্রত্যেক মানুষের বিশেষ যে-কোন কাজই থাকুক না কেন, সেইটির মধ্যেই সে একান্ত আবদ্ধ নয়, তাহার মধ্যে আছে যে নিখিলপ্রতিভা—মূলতঃ সে যে ভগবান সর্ব ঐশ্বর্যশালী।

ব্যক্তিগত কর্ত্তজীবনের উপর যোগের কি প্রভাব আমরা তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু বিশ্বের সমবেত জীবনেও যোগশক্তি এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চলিয়াছে। জগতে যে বিবর্তন চলিয়াছে, মানবজাতি যে স্তরের পর স্তরে উঠিয়া চলিয়াছে তাহা যোগশক্তিকেই আশ্রয় করিয়া। বিবর্তনের মূল প্রণালীটি এই, প্রথমে প্রকৃতি ধীরে

ধীরে আপনার অজ্ঞাতগারে পরিবর্তনের পথে চলিতে থাকে, তারপর এমন একটা অবস্থা, এমন একটা সময় হয় যখন এই স্বাভাবিক মন্থর গতির স্থলে আসে একটা দ্রাবিত গতি, একটা উল্লসন, চিরাত্যন্তকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া একেবারে নূতনের মধ্যে বাইয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই ক্ষিপ্তপরিবর্তন এই ওলটপালটকেই বলা হইয়াছে প্রলয়, কল্লাস্ত। যুগে যুগে ইহাই সেই যুগসন্ধিস্থল যোগমুক্তি ভগবান যখন আবির্ভূত হইয়াছেন, বিশ্বের সাধনাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়া পরিপূর্ণ করিয়া, যোগশক্তিবলে আবার এক নূতন স্রষ্টা করিয়াছেন, নূতন বর্গ-রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা আজ এইরূপ একটা নূতন যুগের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। মানুষ একটা সম্পূর্ণ নূতনতর স্তরে উন্নীত হইতে চলিয়াছে। এবাবৎকাল মানুষ আবদ্ধ ছিল তাহার মানুষীভাবের মধ্যে, তাহার ক্রম-বিবর্তন এই মানুষীভাবের একরকম শিখর পর্যন্ত আসিয়াছে বটে কিন্তু সেইখানে ঠেকিয়া গিয়াছে। আজ মানুষীভাব ছাড়াইয়া মানুষকে উঠিয়া যাইতে হইবে দেবভাবের মধ্যে। আর দেবভাবের কেন্দ্র মৌলিক শক্তিই হইতেছে যোগশক্তি। জাগ্রত সচেতন সজ্ঞান যোগশক্তিই দেবজীবনকে সৃজন করে। প্রাচীন কালে সকল বিবর্তনের নীচে এই যোগশক্তির প্রভাব থাকিলেও, সে যোগশক্তি খেলিয়াছে কতকটা গোপভাবে। আর তাহা অল্প কয়েকজন মানুষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। আজকার প্রেরণা হইতেছে এই নিগূঢ় শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকট করিয়া ধরিতে, সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে। এই নবযুগে প্রত্যেক মানুষই চিগিবে আত্মশক্তি, পাইবে তপঃশক্তি, তাহার জীবনকে গড়িবে নিয়ন্ত্রিত করিবে যোগশক্তি। তবেই সমগ্র মানবজাতি দেবধর্মে, তাহার যুগের বিধিনির্দিষ্ট লোকে উঠিয়া দাঁড়াইবে।

দেবজন্ম

এই নবযুগের সাধক ষাঁহারা, ষাঁহারা বিশ্বাস করেন ধরিত্রীর আজ গর্ভবেদনা দেখা দিচ্ছে দেবতার জন্ম দিবার জন্য, ষাঁহারা নিজেদের মধ্যে আপনার নিখিল ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে এই দেবতারই আসন পাতিয়া দিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সকলেই এই যোগশক্তিকেই আশ্রয় করিবেন। দেবকর্মী তাঁহারা, তাঁহারা জীবনের প্রত্যেক ঝুঁটিনাটি ব্যাপারটি—এমন কি আহার, নিদ্রা, নৈখুন সমস্তই নিব্বাহ করিবেন এই যোগশক্তির বা দেবশক্তির সহায়ে। ধরিত্রী লইলান প্রাকৃত প্রেরণা, মানুষী প্রেরণায় কোন কর্ম সুসম্পন্ন হইলেও হইতে পারে—কিন্তু আমরা তাহা দেখিব না। আমরা চাই দেবপ্রেরণা দিয়াই সমস্ত কর্ম করিতে। যে মানুষই থাকিতে চায়, মানুষীভাবকেই চরন বলিয়া জানে তাহার সহিত আমাদের কথা নাই, সে মানুষের শক্তি, মানুষের গৌরব, মানুষের মহিমা লইয়া থাকুক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি আর এক স্বপ্ন, শুনিয়াছি আর এক মন্ত্র—

আ যে ধামানি দিব্যানি তদ্বুঃ।

জানা ও অজানা

কান্যবস্তুর স্বরূপ জানিলে নাকি তার যা কিছু সৌন্দর্য্য সব লুপ্ত হইয়া যায়। যে-জিনিষের মধ্যে অজানা কিছু নাই, যাকে মিরিয়া কল্পনা আর খেলিবার অবসর পায় না, যাকে নিঃশেষ করিয়া পাইয়াছি, ধরিয়া বসিয়াছি সে ত জড়বস্তু, সে আমার বিচার বুদ্ধির তৃপ্তি দিতে পারে কিন্তু তাতে ত জীবন নাই, সে আমার প্রাণের বস্তু হইবে কিরূপে? যার সব জানিয়াছি দেখিয়াছি সে ত ফুরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু নাগুষের আনন্দের বন যে সেই জিনিষ যা কখন ফুরায় না, শেষ হয় না, যা নিত্য নবরূপে ফুটিয়া উঠিয়া একটা নূতন চেতনা নূতন অনুভূতি জাগাইয়া তুলিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই আগাদিগকে বিস্মিত, মুগ্ধ করিতেছে। এই বিস্ময়ের, এই আকস্মিকের উদ্বেগ জানা বস্তু ত কখন করে না, তাই আমার পক্ষে সে একান্তই নূত।

প্রিয়জন আমার কাছে প্রিয়, কারণ তাকে পাইয়াও যে পাই না, ভগবানের দিকে যে ছুটিয়া চলিয়াছি, সে ত তাঁকে জানি না বলিয়াই—পাইতাম যদি, জানিতাম যদি তবে দেখিতাম আমার যে প্রিয়জন তার ত শুধু—

স্তনো মাংসগ্রহী কনককলসাবিত্র্যপমিতৌ

মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতম্

স্রবন্মুত্রক্লিণং করিবরকরম্পর্বা জঘনং—

আর 'রসো বৈ' যিনি তিনি হইয়া পড়িতেন নিরাকার চৈতন্যমাত্র, দর্শনের একটা তত্ত্বমাত্র। কিন্তু আমার প্রিয় নিত্য নব উষায় নব সৌন্দর্য্যে বিকশিতই হইয়া চলিয়াছে, তাই যে দেখিয়া দেখিয়াও নয়ন

দেবজন্ম

আর তিরপিত হইল না—ভগবান যে নিত্য নব উপলব্ধির মধ্য দিয়া আমাদের ভুলাইয়া লইয়া চলিয়াছেন আপনাকে সদাই কি একটা রহস্যের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া । দূরে থাকিয়া যে প্রলুব্ধ করিতেছে, আকাঙ্ক্ষা জাগাইতেছে কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ তৃপ্তি যাতে না হইয়া যায় সে দিকে সাবধান—এমন জিনিষেরই পাশে না প্রাণের টানে ছুটিয়া চলিরাছি । মানুষ যদি গন্তব্য স্থানেই পৌঁছিয়া যায়, লক্ষ্য যদি আশিতারকার মাথেরই মিলাইয়া যায়, আকাঙ্ক্ষা যদি সব তৃপ্ত হইয়া পড়ে তবে মানুষের লীলা সেই দিনই ফুরাইবে, যে অগ্নি তার প্রাণকে সজ্জ্ব রাখিয়াছিল সেই দিন তাহা নির্বাণ পাইবে ।

কিন্তু তবুও ত প্রিয়বস্তুর জ্ঞানিতেই চাই ধরিতেই চাই—সব-টুকুই জানিতে ধরিতে চাই । এ কি শুধু মায়া-মরীচিকা ? জ্ঞানার মধ্যেও ধরার মধ্যেও কি বিশেষ সৌন্দর্য্য বিশেষ আনন্দই নাই ? না-জানাই প্রধান সত্য, আর জানা বা জ্ঞানার চেষ্টাটা হইতেছে ফাঁকি, খেলাটি জমাইয়া রাখিবার জন্য ? কিন্তু এও ত প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারি না যে প্রিয় বস্তুকে জানি না—এ ত মনে হয় যেন সত্যের অপলাপই করিতেছি । সে বস্তুকে যে বিশেষরূপেই চিনি, তার অপেক্ষা বেশী চিনি জানি আর কাহাকে ? ভগবান দূরে কিন্তু তাঁর অপেক্ষা নিকটে কে ? ভোগ্য-বস্তু ত ভোগ করিবার জন্যই—ফুরাইয়া যায় বলিয়া তার ভোগটা নিরর্থক নিরানন্দ হইয়া পড়ে না, বরং দূর হইতে কেবল নিরীক্ষণ করিয়াই যদি নিরস্ত হই তবেই না তার বিফলতা ? অনুেষণে উল্লাস আছে কিন্তু প্রাপ্তিতে কি সুখ নাই ? কর্ণে আনন্দ আছে, কর্ণফলনাভে কি নাই ? সাধনা আছে অথচ সিদ্ধি থাকিবে-না, সিদ্ধি একটা আদর্শমাত্র এও কি হইতে পারে, না, হওয়া উচিত ? উপ-নিষদই তবে সত্য কথা বলিয়াছেন—তাঁহাকে জানি এ কথা বলিতে পারি না, আবার তাঁহাকে জানি না এ কথাও মুখে আনিতে পারি না ।

বস্তুতঃ প্রিয়কে ভগবানকে জানি না, সেই জানার মধ্য দিয়া যার প্রতিষ্ঠা তর্কবুদ্ধির মধ্যে, বিচারের মধ্যে। এই মনের জানা মনের পাওয়া দিয়াই ধারণ করিতে পারি না সে কাননার কাননাকে। কারণ মনের প্রকৃতিই হইতেছে একটা দিক, একটা ঋণ্ড প্রকরণে আবদ্ধ থাকা—মন জানিতে পারে কেবল অংশবিশেষকে, স্বরূপ দূরে থাকুক রূপের সে বস্তুটুকু জানে তাও অতি অল্প, অতিমাত্র বাহিরেরই। তাই সে জানার কাছে আসল মূল সম্ভাটি চিরদিন প্রতিমুহূর্তেই নব নব বর্ণসম্পাতে কুটিয়া উঠিতেছে, তাই “যুগ যুগ ভরি রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল”। সে যে নিগূঢ়ের অসীমের বস্তু—তাই সে মনের কাছে অচেলা অজানা। কিন্তু এই অজানাকে জানি, বিশেষরূপে জানি, সেই জানার মধ্য দিয়া যে জানা চোখের দেখার উপর নির্ভর করে না, যে জানা মানস-প্রত্যয় নয়—যে জানা হইতেছে জ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি, অপারোক্ষানুভূতি। এই যে তুরীয় চেতনা সেখানে যদি জাগিতে পারি, তবে সেখানে ধরিতে পাই বস্তুর আয়ার অনন্তের সবখানিই। কারণ সেখানে সান্ত দিয়া অনন্তকে ধরিতে চাই না, অনন্ত দিয়াই অনন্তকে আলিঙ্গন করি।

মনের জানা আনাদের কাছে খুব সত্য, খুব স্পষ্ট, একেবারে নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হয়—যতটুকু জানি তা জানি যেন পূর্ণ দিবালোকে। আর তুরীয়ার জ্ঞান বোধ হয় কেমন একটা ভাবের নেশার আবেশ—সে যেন আঁধারে অথবা অস্পষ্টলোকে কেমন ছায়াদেহটিকে হাতড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নয়। বুদ্ধির জানাই গোখুলির আলো-আঁধারের মিশ্রণ। সেখানেই নিশ্চয়তা নাই—সকল নিশ্চয়তার মধ্যে সেখানেই জাগিতেছে আবার সন্দেহ। তুরীয়ার জানা—উপনিষদ যাহাকে বলিয়াছে বিজ্ঞান, যাহা হইতেছে চিদ্মন—কেবল তারই মধ্যে নাই কোন ছায়া কোন কুয়াসা কোন অস্পষ্টতা। চোখের দেখা যেমন স্পষ্ট দৃষ্টির দেখাও তেমনি, তাহা অপেক্ষা আরও

দেবজন্ম

বেশী স্পষ্ট—পূর্ণতর, রেখায় রেখায় স্ফুট। সত্যের অনন্তের এই উজ্জ্বল মূর্তিকে দেখিবার জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ প্রতিনিয়ত চাহিয়াছেন—জ্যোক্ত চ সূর্যং দৃশে, অনিমেষ দৃষ্টিতে অবিরাম বেন আমরা জ্ঞানের পরা সত্যটি নিরীক্ষণ করিতে পারি।

এই আশ্রয়, এই বিজ্ঞানময়ের চেতনায় প্রবুদ্ধ হইয়া যখন জিনিষ দেখি, তখন সে জিনিষ আর অজ্ঞানার ঘোরে আবৃত কিছু থাকে না, তাহা উলঙ্গ উন্মোচিত হইয়াই দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, এই অতীন্দ্রিয়ের এই পরাজ্ঞানের দীপ্ত চেতনা মনকেও আলোকিত করিয়া তোলে, বুদ্ধিরও মধ্যে এমন একটা পরিস্ফুট আসে যে সেখানেও অতীন্দ্রিয়ের একটা যথাযথ প্রতিকৃতি ভাসিয়া উঠে। বুদ্ধি আর আবরক মাত্র নয়, তা হয় প্রকাশক। বুদ্ধিরও মধ্যে এমন সব রেখাসম্পাত হয়, এমন সব সংজ্ঞা জাগিয়া ওঠে যা অনির্দেশ্যের অনন্তভাবেই স্ফুট, জাগ্রত, বিগ্রহান্বিত করিয়া প্রকটিত করে। বুদ্ধির জ্ঞানার মধ্যে তুরীয়ার জ্ঞানা আসিয়া ধরা দেয়। ভগবান তখন অবতার হইয়া দেখা দেন, তখনি মানুষী বিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বথা চালিয়া দিয়াও ভগবান তাঁহার ভাগবত সত্তাকে কিছু খর্ব্ব করিয়া ফেলেন না। তখনই আমার প্রেমাস্পদকে দেখি আর এক নুতন চক্ষে। তাহা আশ্রয় অশরীরী অবাঙ্-মনসোগোচর সত্তাটুকু নয়, আবার তাহা কেবল মাংসগ্রন্থিমাত্রও নয়—তখন প্রিয়জনের পর্বে পর্বে দেখি উপভোগ করি অন্তরাশ্রয় অনন্তেরই যে বিশেষ রস উন্মোচিত হইয়া ধরা দিয়াছে। জানি না বলিয়া যে তাকে সুন্দর দেখি এমন নয়, তার সবখানি জানি বলিয়াই সে তখন সুন্দর।

অজ্ঞানার দূরের না-পাওয়ার আনন্দ আছে—যৌবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনার আনন্দ আছে। আবার জ্ঞানার নিকটের পাওয়ারও আনন্দ আছে। প্রবীণতার যে স্থির তৃপ্তি, লব্ধবস্তুর ভোগ তারও আনন্দ

জানা ও অজানা

আছে। ফুলের সৌরভ স্মৃশমা আছে, পকু ফলের আছে স্মৃশদু রস—
 উভয়ই স্মন্দর, সমান সার্থক। না, বরং বলিব ফলেরই মধ্যে ফুলেরও
 সার্থকতা। ফলে যাইয়া ফুল শেষ হইয়া ফুরাইয়া যায় নাই—আরও নিবিড়
 গভীর হইয়াই উঠিয়াছে। অজানার স্মৃশমা সেই রকম কেবল আপনাকে
 ছড়াইয়া উধাও হইয়া চলিয়াছে, জানার মধ্যে সে স্মৃশমা গাঁড়, রসবৎ
 আত্মস্থিতিতে ভরপুর হইয়া পরিপূর্ণ।

ব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ

উপনিষদ গাথার তুলনা নাই। উহা কেবল পড়িবার জিনিষ নয়, উহা ধ্যান করিবার জিনিষ। এমন কি শুধু ভাবমুগ্ধ হইয়াও উহার সমস্তখানি সত্য সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব আমরা আন্বাদন করিতে পারি না। কারণ ভাবাবেশে আমরা পাই আনন্দায়া কথা, বেশীর ভাগ তাহা মনগড়া কল্পনার সৃষ্টি, বড় জোর না হয় ধরিতে পারি মোটামুটি বক্তব্য যতটুকু। কিন্তু উপনিষদ এই রকম খুব সাধারণভাবে বুঝিলে কিছুই বুঝা হইল না। উপনিষদের প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ, এমনি প্রত্যেক বর্ণ চয়ন করিয়া তবে বসান হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই দরকারী বিশেষ অভিব্যঞ্জনা, বিশেষ অর্থদ্যোতনার জন্য। একখানি চিত্রে যেমন থাকে একটা সাধারণভাব, সেই সাধারণ ভাবটি সমস্তখানি পটে ছাইয়া রহিয়াছে কিন্তু এই সাধারণ ভাবটিকে অর্থগৌরবে ভরাট করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দরকার হইয়াছে প্রত্যেক টান প্রত্যেক রং প্রত্যেক ভঙ্গিমা—ইহাদেরও আছে একটা বিশেষ ভাব বিশেষ অর্থ। উপনিষদের গাথার মধ্যেও সেইরকম কোন কিছু নিরর্থক, নিপ্রয়োজন বা অপ্ৰয়োজন নাই—তাহার মধ্যে পাদপূরণ বলিয়া কিছু নাই—সবই significant.

অন্য কথায়, আগাদের উপনিষদ শুধু দর্শন নয়, শুধু কবিতা নয়, আগাদের উপনিষদ হইতেছে মন্ত্র। আজকাল আমরা মন্ত্র বলিয়া কিছু আছে তাহা মানি না, বলি এসব কুসংস্কার বর্বরমূলভ নিব্বুদ্ধিতা। কিন্তু মন্ত্র জিনিষটি যে আদৌ কি রকম বস্তু তাহা বুঝিবার কোনই আয়াস লই না। আমরা মনে করি, সচরাচর মুখে যেমন কথা বলি, সেই রকমই

একটা কথা স্থানের অভাবে, অবসরের অভাবে সুবিধার জন্য সংক্ষেপে গড়িয়া লই আর ইহাকেই নান দেই মন্ত্ৰ, এরকম কথার আবার বিশেষ কি সাহায্য থাকিতে পারে ? কিন্তু বাস্তবিক তাহা নোটেও নয় । ক্রীং ক্রীংকে শিশুর প্রলাপ বলিয়া উপহাস করি কিন্তু বীর স্থির হইয়া বিচার করিতে চেষ্টা করি না, যাঁহারা এই প্রলাপকেই জীবনসাধনার ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন তাঁহারা এত বড় মূৰ্খ হইলেন কি করিয়া, না, তাঁহারাও একটা সত্যকেই পাইয়াছিলেন, এই সত্যকেই ধরিয়া সাধনা করিতে ছিলেন ।

ব্রহ্ম বা আত্মা বা মূল সত্য যাহা তাহা শুধু সৎ নয়, তাহা আবার তপঃ অর্থাৎ তাহাতে রহিয়াছে শক্তির গতি—শক্তির এই গতি-তরঙ্গ হইতে উদ্ভিত হইতেছে এক মুচ্ছনা, এক ছন্দ, এক শব্দ, এক ধ্বনি । মূল শক্তি যেমন বহুধা হইয়া ক্রমে আপনাকে স্থূল হইতে স্থূলতর রূপে ঢালিয়া দিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সঙ্গে যুগপৎ সেই মূল শব্দব্রহ্ম সেই অনাহত বাণীরও ক্রমবিবর্তন চলিয়াছে । মানুষের ভাব চিন্তা জ্ঞান তপঃশক্তির চৈতন্যের দিকটা প্রতিকলিত করিতেছে, মানুষের ভাষাও তেমনি তপঃশক্তিরই বীজধ্বনি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—মন্ত্ৰ চেষ্টা করিয়াছে ভাষার মধ্যে সেই মূল অবিকৃত নাদব্রহ্মকে স্ফুট জাগ্রত করিয়া ধরিতে । কারণ, মানুষ যতই তাহার আদিম অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, দিব্যজ্ঞানের পরিবর্তে আসিয়াছে বিচার বিতর্ক অনুমান সিদ্ধান্ত, তাহার ভাষাও হারাইয়া ফেলিয়াছে বীজধ্বনির, মন্ত্রের প্রতিভা, অর্থের যে আপন বিগ্রহ বাক্ তাহার পরিবর্তে সে রচিয়াছে মনগড়া শব্দ বাক্য । অতীত যেরূপ ভাষা তাহার মধ্যে যাঁহারা কবিশ্রেষ্ঠ তাঁহাদেরই মধ্যে কথঞ্চিৎ পাই এই মন্ত্রের দ্যোতনা, তাই তাঁহাদিগকে বলি মন্ত্ৰদ্রষ্টা, ঋষিকবি । উপনিষদের ঋষিকবির মধ্যে এই মূল আদিম মন্ত্রশক্তির দ্যোতনা আরও স্পষ্ট, আরও নিবিড় ।

দেবজন্ম

এই উপনিষদের মন্ত্র কিন্তু আমরা পড়ি ও বুঝিতে চেষ্টা করি একটা অস্পষ্ট অনুবাদের মধ্য দিয়া। তাই সেখানে যে সব সুস্পষ্ট বর্ণসম্পাত রহিয়াছে তাহা কিছু ধরিতে পারি না একটা স্থূলহস্তের অবলেপে সে সকলকে একাকার করিয়া ফেলি। উপনিষদ যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের বর্তমান কালে যে অর্থ সেই অর্থ দিয়াই আমরা উপনিষদের ব্যাখ্যা করি। অথবা বর্তমান কালে সে শব্দের ব্যবহার না থাকিলে বর্তমান কালের শব্দের যে মূল্য দিয়া থাকি তাহারও সেই মূল্যই নিরূপণ করি। আধুনিক ভাষা সকলের ন্যায় উপনিষদের ভাষাও অর্থের একটা কৃত্রিম বাহন মাত্র—এরূপ বলিলে একটু ভুলই হইবে। উপনিষদের প্রত্যেক শব্দের সহিত কিন্তু নিশিয়া রহিয়াছে সেই শব্দেরই একটা মৌলিক ভাব, একটা নৈসর্গিক অর্থ ব্যঙ্গনা—সেই-টুকুর ব্যাখ্যা দিতে না পারিলে উপনিষদ গাথা অব্যাক্ষাতই রহিয়া যায়।

ধর উপনিষদের এই প্রশস্তি গাথাটি—

স্থিরৈরদৈন্তুষ্টিবাংসন্তনুভিঃ।

ব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ॥

ইহার একটি প্রচলিত অনুবাদ এইরূপ আছে দেখিয়াছি : “স্থিরতর অঙ্গসম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আর্য তাহা যেন ভোগ করিতে পাই।” মহামন্ত্রের যে মহত্ত্ব, যে গাভীর্য্য, যে চমৎকারিতা তাহার নিদর্শন কিছু পাওয়া দূরের কথা, এ কথাগুলির যে কোন বিশেষ অর্থ আছে তাহা আমরা জানি না। অনুবাদক উপনিষদের ভাবরাজ্যে মোটেও যাইতে পারেন নাই; কোন চেষ্টাও করেন নাই। মূলে যাহা আছে যথাসম্ভব সেই কথাগুলিই হুবহু অনুবাদে বসাইয়া দিয়াছেন, ঋষিকবি সে শব্দগুলির দ্বারা কোন অর্থ কোন ভাব ফুটাইতে চাহিয়াছেন তাহার কোন ইঙ্গিত এখানে পাই না।

উপনিষদ বলিতেছেন, সেই “আয়ু”, সেই জীবন, সেই প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবন-প্রবাহ যাহা নিহিত দেবসত্তার মধ্যে, বাহাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া ধরিয়াছে ভাগবত সত্তা (দেবহিতং), সেই জীবনকেই যেন আমরা অধিকৃত অধিগত করিতে পারি, উহাই যেন ভোগ করিতে পারি আর সেই অধিকার সেই ভোগ হইবে না অল্প, হইবে না ঋণিত, তাহা হইবে স্তুবিস্তীর্ণ, বিপুল, পূর্ণ-ভূনা (বি+অশেন)। এই বিরাট দিব্যজীবন পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে, তাহার অধিকারী হইতে হইলে কি প্রয়োজন? সেজন্য চাই প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইবে স্থির অচঞ্চল, “আপূৰ্ণ্যমানং অচলপ্রতিষ্ঠং”—দেব-জীবনের যে মহান্ অৰ্ণব তাহাকে ধারণ করিবার ভরপুর সামর্থ্য, সে তাহার সকল ঐশ্বর্য্য সকল বিভূতি লইয়া আবির্ভূত হইবে কিন্তু কোন ইন্দ্রিয় শ্রান্ত হইবে না, টলিবে না। আধারের প্রতি অঙ্গ, আর প্রতি অঙ্গের যে প্রতি তনু, প্রতি আয়তন, প্রতি ক্ষেত্র—দেহ নন প্রাণ প্রভৃতি সকল স্তরের, সকল ধর্ম্ম সকল কর্ম্ম সকল ভোগ—এ সকলের মধ্যে, সকলকে ঘিরিয়া উল্লোখিত করিব সেই স্তোম, সেই মন্ত্র, সেই ব্রহ্মবাণী, সেই ভাগবত প্রেরণা যাহা সে ‘দেবহিত’ জীবনকে প্রতিনিয়ত বিধৃত রাখিবে, স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিবে (তুষ্ণুবাংসঃ)।

জীবন চাই, প্রাণের খেলা চাই, এই পার্থিব আয়তনে যে লীলা তাহাই চাই। এই আয়ুকে বিপুল করিয়া, মহৎ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে কুঠাছীন হইয়াই ভোগ করিতে চাই। কিন্তু সে জীবন এক দিকে যেমন বিরাগীর জীবন নয়, অন্য দিকে তেমনি পশুরও জীবন নয়। তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে দেবতার সত্তা দিয়া, ভগবানের মুখনিঃসৃত তপঃবাণীর তেজে ভরিয়া। পশুর মত এ জীবনলীলা মত্ত অন্ধ চঞ্চল অধীর হইবে না কিম্বা সাধু সন্ন্যাসীর মত রসের দুই প্রকার প্রকরণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না—তাহা হইবে সকল রকম ঐশ্বর্য্যে বৈচিত্র্যে

দেবজন্ম

তরঙ্গায়িত, যত দেবতা যত রূপ ধারণ করিয়া যত ভোগ গ্রহণ করিতে
পারে সকলেরই স্থান এই বিরাট এই স্ফূট মন্দিরে, সকলের জন্যই
আনাদের অন্তরাঙ্গার বাণী অচ্যুত আসন রচিয়া দিবে।

ধন্যং শরণং গচ্ছামি

মানুষ চিরকাল ধরিয়াই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে সমাজের ভিতরে আবার সমাজ গড়িয়া তুলিতে। এই যে চাকার মধ্যে চাকা, নাটকের মধ্যে উপনাটক, ইহারই নানা নাম ও রূপ হইতেছে সমাজ, সমিতি, সমবায়, সম্প্রদায়, মণ্ডল, গোষ্ঠী ইত্যাদি। ফলতঃ বলা যাইতে পারে এই রকম নানা খণ্ড সমাজের বা দলের সমষ্টি ছাড়া সমাজের পৃথক অস্তিত্ব নাই। মনুষ্যের কেন এই চেষ্টা? কোন্ সাধকতার জন্য এই দ্বিজাত সমাজের উদ্ভব?

মানুষের যে স্বাভাবিক সাধারণ আদি সমাজ তাহা গড়িয়া উঠিয়াছে বাহ্য প্রয়োজনের বশে, প্রকৃতির তাড়নায়। সে সমাজ মানুষ সমাজে সৃষ্টি করে নাই, তাহা হইতেছে মানুষের অচেতন স্বভাবের প্রকাশ; তাহার কাঠান দিয়াছে মানুষের দেহগত ও প্রাণগত দাবী। সেখানে যে শক্তি সর্বস্বর্বা হইয়া কাছ করিতেছে তাহারই নাম, বাণার্ড শ' এর ভাষায়, Life-force; এই শক্তির হাতে মানুষ পুতুল মাত্র, সুতরাং এই আদি সমাজে মানুষের পৃথক ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য কিছু উপলব্ধি করিবার, সার্থক করিবার নাই। আহা! নিদ্রা মৈথুনই এই স্তরের পরম পুরুষার্থ—প্রকৃতির এই মৌলিক ত্রিধা গতিই দিয়াছে সমাজের গোড়ার বাঁধন গড়ন।

কিন্তু মানুষ অনু কি প্রাণ-সর্বস্ব নয়। অনু ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম—সন্দেহ নাই; তাই ত অনু প্রাণের তাগিদ কি রকমে মিটান যায় তাহার ব্যবস্থা

দেবজন্ম

আগে হইল। ততঃ কিং? দেহ প্রাণের সাথে সাথে, দেহ প্রাণের উপরে মানুষের আছে মন। এই মনও ব্রহ্ম। মনের তাগিদও মিটাইতে হইবে—তাহা হয় কি ভাবে, মনের ধর্ম কি, মন চায় কি?

প্রাণের স্তরে উঠিয়া মানুষ হইয়াছে সজীব, সচল—কিন্তু প্রাণকেই যদি সে একান্ত করিয়া বরিয়া চলিত তবে সে হইয়া থাকিত অচেতন অজ্ঞান। মনে উঠিয়া মনের সহায়ে মানুষ হইয়াছে সচেতন সজ্ঞান; তাই আর সে প্রকৃতির তাঁবেদার হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না, সে চায় এখন প্রকৃতির উপর হুকুমদারী করিতে। মনের দৌলতে মানুষের চক্ষু ফুটিয়াছে, তাই প্রকৃতির কাছে সে দেখিতে পাইতেছে অনেক দোষ ত্রুটি অভাব, আর নিজের মধ্যেও তাহার জাগিয়াছে নানা কল্পনা, বিবিধ আদর্শ; নূতন নূতন কৃত্ত্বতার সার্থকতার দ্বারা সব। পড়িয়া পাওয়া সমাজে মানুষের আর মন উঠিতেছে না, সে চাহিতেছে প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছামত চালিয়া পিটিয়া গড়িয়া তুলিতে—সমাজের মধ্যে এই সজ্ঞান সৃষ্টির নাগই সজ্জ, সম্প্রদায় ইত্যাদি।

মানুষের মধ্যে মনের বিকাশ প্রাণেরই কোলে, আদি কাল হইতে। স্মৃতির সজ্জ বা গোষ্ঠী রচনাও হইয়া আসিয়াছে আদি কাল হইতে। সমাজের ভিতর হইতে তাহার গোষ্ঠীগুলি আলাদা করিয়া ছিঁড়িয়া লওয়া যায় না, গোষ্ঠীকে বাদ দিয়া আদিম সমষ্টির রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। সমাজের শৃঙ্খলায় মানুষের সজ্ঞানে রচিত বিধিব্যবস্থা আর অজ্ঞানে উদ্ভূত রীতিনীতি দুইই ওতপ্রোত নিশিয়া রহিয়াছে।

তবে দেহ প্রাণ হইতে মন যত সরিয়া সরিয়া গিয়াছে, যত নিজ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে ততই তাহার রচনা সমাজ হইতে যেন পৃথক হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সময়ে সময়ে মনের এই স্বাধীন স্বতন্ত্র যাত্রা এত তীব্র, এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে সমাজের সহিত বিরোধ ঘোষণা করিয়া নিজের দল গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। মানব-

সমাজে নানা বর্ন, সজ্জ, বিবিধ “ইউটোপিয়া” (Utopia) জন্ম লইয়াছে, জন্ম লইতে চেষ্টা করিয়াছে মানুষের এই আদর্শ পরায়ণতার আবেগে, মনের স্বাধীন সজ্জন সৃষ্টিপ্রেরণায়।

কিন্তু মনের সজ্জনে সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যেরও একটা সীমা আছে, আমরা দেখি আদর্শকে ধরিয়া যে গোষ্ঠি বেখানেই সৃষ্টি হইয়াছে খুব বেশী দিন শুদ্ধরূপে তাহা স্থায়ী হয় নাই—সে আদর্শ মনের বত উঁচু স্তরেরই হউক না কেন (বরং আদর্শ মনের বত উঁচু স্তরের হয়, তাহার পতনের সম্ভবনাও ঠিক ততই বেশি দেখা যায়।) প্রাণের দাবীকে, দেহের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া, অন্ততঃ তাহাদের সাথে একটা আপোষ বা মিতানি না করিয়া, মনের কোন আদর্শই নিজের জোরে নিজের মাহাত্ম্যে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। বস্তুজগতের উপরে মনের সে আধিপত্য নাই। মন বত উঁচুতেই উঠিয়া যাক না, দেহের ও প্রাণের টান সে কখন কাটাইতে পারে না, আজ হউক, কাল হউক দেহের ও প্রাণের টানে মন ও মনের সৃষ্টি ধীরে ধীরে নীচের দিকে সাধারণের দিকে নামিয়া আসে—প্রথমে যে সৃষ্টি ছিল আদর্শোচিত, তাহা শেষে প্রাকৃত আকার ধারণ করে। আদর্শের সজ্জ শেষে সাধারণ সমাজের একটা প্রাকৃত অংশ হইয়া পড়ে—এই রকমে কত সজ্জ কত গোষ্ঠি, হে বৃহৎ সমাজ-পুরুষ!

“তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাংগর লহরী সমানা।”

মানুষের সৃষ্টি সাময়িক দেশিক—নশ্বর; কারণ মানুষ যতদিন শুধু দেহ প্রাণ ও মন লইয়া আছে ততদিন সে হইতেছে মৃত্যুর সম্ভান। মনের শিখরে দাঁড়াইয়া মানুষ আপনাকে হাওয়ার জীব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে; কিন্তু বস্তু-রচনা প্রয়াসে সে বিশ্বাস পদে পদে প্রতিহত হইয়া বাইবে। মন দাঁড়াইয়া আছে প্রাণের উপর, আবার প্রাণ দাঁড়াইয়া আছে জড়ের উপর। বাস্তবে কিছু সৃষ্টি করিতে গেলে বাস্তবের বস্তু জড়ের কাছে মূল্য দিতেই হইবে; সে মূল্য হইতেছে মৃত্যু।

দেবজন্ম

কিন্তু ভয় নাই। মন পর্যাস্ত উঠিয়াই মানুষের চলা শেষ হইয়া যায় নাই। মন ব্রহ্ম, আমরা উপলব্ধি করিয়াছি—ততঃ কিং? তাহার পরে সহজ চলা নয়, একটা যেন ভিগবাজী দিয়া মানুষকে গিয়া পড়িতে হইতেছে সম্পূর্ণ আর এক ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এই অতিমানস ভূমিতে জাগিয়া উঠিলে দেখিব দেহ বা জড় সেখানে প্রতিষ্ঠা নয়, প্রতিষ্ঠা হইতেছে সত্য—জড় সেখানে দিতেছে শুধু ভূমীর একটা আকার বা অবয়ব। মানুষ সেখানে সৃষ্টি করিতে গিয়া নীচে হইতে ক্রমে উপরে গড়িয়া তোলে না, সে উপর হইতে উপরকে ধরিয়া নীচে নামিয়া আসে; এখানে উঠিয়া বস্তুতঃই দেখিতে পাই উল্কাগুলোঃশাখ—

এই অতিমানস লোকই হইতেছে উপনিষদের বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম, বেদমন্ত্র ইহাকেই বলিয়াছে সত্যং ধাতং বৃহৎ, স্বলোক, দেবতার বাস—এখানে উঠিয়াই মানুষ লাভ করে তাহার দিব্য স্বভাব। দেহ প্রাণ মন এই ত্রয়ী লইয়া হইতেছে সৃষ্টির ‘অপরার্থ’, মানুষের প্রাকৃত প্রকৃতি; অপারার্থের উপরে সৃষ্টির একটি পরার্থ আছে—যেখানে দেহ প্রাণ মন তাহাদের রূপান্তরিত স্বরূপে অবস্থিত। স্বরূপের দেহ প্রাণ মন কি ধরণের বস্তু তাহাদের বর্ণন করি কি—কিন্মাণীতব্রজেত কিন্; স্বরূপ বোধ হয় ‘আশ্চর্যবৎ’, তাহা সম্যক ব্যাখ্যা করিবার জিনিষ নয়। তবে এইটুকু বলা বাইতে পারে যে স্বরূপের দেহ জড় পদার্থ নহে, তাহা হইতেছে সাক্ষ চেতনা (সৎ), স্বরূপের প্রাণ বাসনার উদ্বেল উচ্ছল সাগর নয়, তাহা প্রশান্ত তপঃশক্তির অনোষ ইনণা, আনন্দের অনুভবী, আর মন সেখানে তর্কের কল্পনার বৃত্তি নয়, তাহা হইয়া গিয়াছে সাক্ষাৎ দৃষ্টি, অপারোক্ষ সত্য উপলব্ধি, পূর্ণ জ্ঞান-সূর্য্যের অসম্বৃত প্রকাশ।

ব্যক্ত প্রকৃতি—দেহ প্রাণ মন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, এই কথাটির এমন অর্থ নয় যে জীবন বিসর্জন দিয়া কোন রকম এক সঙ্গাধির মধ্যে লীন হইতে হইবে। আমরা তাহা মোটেও বলি না, ব্যক্ত

প্রকৃতি কেবলই মায়া নয়, দেহ প্রাণ নন মরীচিকা নয়। দেহের সত্য আছে সার্থকতা আছে, প্রাণের সত্য আছে সার্থকতা আছে, মনের সত্য আছে সার্থকতা আছে—তবে আনাদের প্রাকৃত স্বভাবের অভ্যন্ত সংস্কার অনুসারে নয়—নেদং যদিহনুপাগতে। ইন্দ্রিয়েরই মধ্যে অতীন্দ্রিয়কে সূক্ষ্মমান করা যায়—ইন্দ্রিয় প্রাকৃত বস্তু বলিয়া নিরিন্দ্রিয় হওয়াই একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত, এই রকম বাধ্য-বাধকতা নাই। রূপ নশ্বর বলিয়া অরূপের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া দিতে বলি না, রূপের পিছনে সত্য যে স্বরূপ সেই স্বরূপকেই রূপান্বিত করিয়া ধরিতে বলি। এই স্বরূপের মানুষ, বৈদিক ঋষিদের কথায়—স্বর্গের বা জ্যোতির মানুষ দিব্য জন (দিবো নরঃ, দিবঃ বিশঃ, দৈব্যাং জনঃ) যদি পৃথিবীতে গড়িয়া উঠে, তবেই কেবল মানুষ তাহার সংসারকে সনাত্নকে আর মৃত্যু দিয়া নয়, কিন্তু অমৃতত্ব দিয়াই সৃষ্টি করিতে পারিবে।

ইহাই কি কখন সম্ভব? এই ধরনের অবস্থা কি কখন মাটির পৃথিবীতে আসিতে পারে? প্রকৃতির উপর জরী হইয়া মানুষ দেবতা হইয়া উঠিবে—কিন্তু কত জনার আছে সেই শক্তি? একটা দল বা গোষ্ঠী গড়িবার মত “স্বজন” যথেষ্ট নিলিবে কি?

কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আদৌ একটা উদ্ধৃমুখী গতি রহিয়াছে তাহার আসল হেতু কি, কোথায় তাহার মূল উৎস? প্রাকৃত স্বভাবের সার্থকতার জন্য মানুষ অবশ্য চিরকালই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তবুও কেবল ঐটুকুতে কোন দিন তাহার পূর্ণতুষ্টি হয় নাই। একটা কি অতিপ্রাকৃতের সাড়া সূদূর আদিকাল হইতে তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ স্বভাবতই ভোগী, প্রকৃতির হাতে অসহায় পুতুল; তেমনি স্বভাবতই সে আবার জিজ্ঞাস্ত, সাধক। মানুষের জননী বটে পৃথিবী কিন্তু স্বর্গ হইতেছে তাহার জনক—দৌর্মে পিতা মাতা পৃথিবী। মানুষের দেহ মাটিতে গড়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরায়া নানিয়া

দেবজন্ম

কিন্তু ভয় নাই। মন পর্যন্ত উঠিয়াই মানুষের চলা শেষ হইয়া যায় নাই। মন ব্রহ্ম, আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছি—ততঃ কিং? তাহার পরে সহজ চলা নয়, একটা যেন ডিগবাহী দিয়া মানুষকে গিয়া পড়িতে হইতেছে সম্পূর্ণ আর এক ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এই অতিমানস ভূমিতে জাগিয়া উঠিলে দেখিব দেহ বা জড় সেখানে প্রতিষ্ঠা নয়, প্রতিষ্ঠা হইতেছে সত্য—জড় সেখানে দিতেছে শুধু স্থায়ী একটা আকার বা অবয়ব। মানুষ সেখানে সৃষ্টি করিতে গিয়া নীচে হইতে ক্রমে উপরে গড়িয়া তোলে না, সে উপর হইতে উপরকে ধরিয়া নীচে নামিয়া আসে; এখানে উঠিয়া বস্তুতঃই দেখিতে পাই উর্দ্ধে মূলোৎস্রাভ—

এই অতিমানস লোকই হইতেছে উপনিষদের বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম, বেদমন্ত্র ইহাকেই বলিয়াছে সত্যং ধাতং বৃহৎ, স্বলোক, দেবতার ধান—এখানে উঠিয়াই মানুষ লাভ করে তাহার দিব্য স্বভাব। দেহ প্রাণ মন এই ত্রী লইয়া হইতেছে সৃষ্টির ‘অপরার্থ’, মানুষের প্রাকৃত প্রকৃতি; অপরাধের উপরে সৃষ্টির একটি পরাধ আছে—যেখানে দেহ প্রাণ মন তাহাদের রূপান্তরিত স্বরূপে অবস্থিত। স্বরূপের দেহ প্রাণ মন কি ধরণের বস্তু তাহাদের ধর্ম কর্তৃক কি—কিনাঙ্গীতব্রজেত কিং; স্বরূপ বোধ হয় ‘আশ্চর্যবৎ’, তাহা সত্যক ব্যাখ্যা করিবার জিনিষ নয়। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে স্বরূপের দেহ জড় পদার্থ নহে, তাহা হইতেছে সাক্ষ চেতনা (মৎ), স্বরূপের প্রাণ বাসনার উদ্বেল উচ্ছল সাগর নয়, তাহা প্রশান্ত তপঃশক্তির অনোঘ ইনশা, আনন্দের অন্তর্ধারা, আর মন সেখানে তর্কের কল্পনার বৃত্তি নয়, তাহা হইয়া গিয়াছে সাক্ষাৎ দৃষ্টি, অপরোধ সত্য উপলব্ধি, পূর্ণ জ্ঞান-সূর্য্যের অসম্বৃত প্রকাশ।

ব্যক্ত প্রকৃতি—দেহ প্রাণ মন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, এই কথার এমন অর্থ নয় যে জীবন বিসর্জন দিয়া কোন রকম এক সমাধির মধ্যে লীন হইতে হইবে। আনন্দ তাহা মোটেও বলি না, ব্যক্ত

প্রকৃতি কেবলই মায়া নয়, দেহ প্রাণ নয় মরীচিকা নয়। দেহের সত্য আছে সার্থকতা আছে, প্রাণের সত্য আছে সার্থকতা আছে, মনের সত্য আছে সার্থকতা আছে—তবে আমাদের প্রাকৃত স্বভাবের অভ্যন্ত সংস্কার অনুসারে নয়—নেদং বদ্বিদনুপাগতে। ইন্দ্রিয়েরই মধ্যে অতীন্দ্রিয়কে সূক্ষ্মমান করা যায়—ইন্দ্রিয় প্রাকৃত বস্তু বলিয়া নিরিন্দ্রিয় হওয়াই একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত, এই রকম বাধ্য-বাধকতা নাই। রূপ নশ্বর বলিয়া অরূপের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া দিতে বলি না, রূপের পিছনে সত্য যে স্বরূপ সেই স্বরূপকেই রূপান্বিত করিয়া ধরিতে বলি। এই স্বরূপের মানুষ, বৈদিক ঋষিদের কথায়—সর্গের বা জ্যোতির মানুষ দিব্য জন (দিবো নরঃ, দিবঃ বিশঃ, দৈব্যাং জনং) যদি পৃথিবীতে গড়িয়া উঠে, তবেই কেবল মানুষ তাহার সংসারকে সনাজকে আর মৃত্যু দিয়া নয়, কিন্তু অনৃত্য দিয়াই সৃষ্টি করিতে পারিবে।

ইহাই কি কখন সম্ভব? এই ধরণের অবস্থা কি কখন মাটির পৃথিবীতে আসিতে পারে? প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া মানুষ দেবতা হইয়া উঠিবে—কিন্তু কত জনার আছে সেই শক্তি? একটা দল বা গোষ্ঠী গড়িবার মত “স্বজন” যথেষ্ট মিলিবে কি?

কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আদৌ একটা উদ্ধৃমুখী গতি রহিয়াছে তাহার আসল হেতু কি, কোথায় তাহার মূল উৎস? প্রাকৃত স্বভাবের সার্থকতার জন্য মানুষ অবশ্য চিরকালই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তবুও কেবল ঐটুকুতে কোন দিন তাহার পূর্ণতুষ্ট হয় নাই। একটা কি অতিপ্রাকৃতের সাড়া স্নদুর আদিকাল হইতে তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ স্বভাবতই ভোগী, প্রকৃতির হাতে অসহায় পুতুল; তেমনি স্বভাবতই সে আবার জিজ্ঞাসু, সাধক। মানুষের জননী বটে পৃথিবী কিন্তু স্বর্গ হইতেছে তাহার জনক—দৌর্দে পিতা মাতা পৃথিবী। মানুষের দেহ মাটিতে গড়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরায় নানিয়া

দেবজন্ম

আসিয়াছে উপরের এক জ্যোতির্গুণ হইতে। ফলতঃ বাহিরের দিক দিয়া প্রকৃতির মধ্যে দেখি যে ক্রম-বিবর্তন, তাহার কারণ ভিতরের দিকে একটা অবতরণ। উপর হইতে অবতীর্ণ সত্য-পুরুষের চাপেই প্রথমে যাহা ছিল জড় তাহা গচল হইয়া উঠিয়াছে ; সেই চাপ যেনন নিবিড়তর হইয়া চলিয়াছে, প্রাণও তেমনি মনে রূপান্তরিত হইয়াছে। যাহা ছিল নির্জীব তাহা হইল সজীব, সজীবও আবার হইয়া উঠিল সজ্ঞান। সজ্ঞান হইয়াও মানুষ নিরন্ত হইতে পারিতেছে না—উপর হইতে আরও চাপ আসিতেছে অর্থাৎ উপর একেবারে নীচের কোলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, উপরেরই ধর্মে মানুষের নীচের সম্ভা ও জীবন গড়িয়া উঠিবে। এখন কেবল সজ্ঞানে নয়, মানুষকে চলিতে হইবে পরাজ্ঞানে—ইহা মানুষের ভবিষ্য গতি।

অজ্ঞানে মানুষের যে সমবেত জীবন তাহার ক্ষেত্র সমাজ, সজ্ঞানে যে সমবেত জীবন তাহা হইতেছে সম্ম, সম্প্রদায় ; পরাজ্ঞানে মানুষের যে সমবেত জীবন সৃষ্ট হইল, তাহার নাম ও রূপ এখনও প্রকট হয় নাই ; কারণ আগে চাই পরাজ্ঞানের সত্য ও ধর্ম সংস্থাপন।

অতীতে ধর্মের সম্ম অনেক গড়া হইয়াছে, বর্তমানেও অনেক হইতেছে—ব্যর্থতা ও বিফলতা যদি আসিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে সে সকল প্রয়াসে বনিয়াদ ঠিক হয় নাই—এখনও মনের গভীর মধ্যে ঘুরিতেছি, ফিরিতেছি ; এখনও “সত্য”কে পাই নাই, আদর্শের অনুসরণ করিতেছি ; ধর্ম পাই নাই, ধরিয়া রহিয়াছি বিধান বা ব্যবস্থা। ফলতঃ “আদর্শ” নামে যে বস্তুর সেবা ও সাধনা সচরাচর আমরা করিয়া থাকি তাহা হইতেছে মানসিক চেতনার মধ্যে উপরের সত্য বা ধর্ম যতটুকু প্রতিফলিত প্রতিবিম্বিত এবং বিকৃত হইয়া দেখা দেয়। জীবনকে সজ্ঞানে গড়িবার জন্য মনের দেওয়া (অবশ্য উপরের একটা চাপের ফলে) এই সকল ছাঁচেরই নাম আদর্শ।

যে সকল আদর্শ “আধ্যাত্মিক” বলিয়া পরিচিত, আধ্যাত্মিক সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত, কার্যতঃ দেখি তাহারাও মনের পরিধি অতিক্রম করে নাই—মনের সর্বোচ্চ কোঠার জিনিষ তাহারা হইতে পারে, তবুও মনেরই জিনিষ। সত্যকার আধ্যাত্মিক বস্তু কেহ কখন অধিগত করেন নাই, এই অসম্ভব কথা আমরা বলিতেছি না। যুগে যুগে দেশে দেশে আধ্যাত্মিক পদবীতে উঠিয়া গিয়াছেন অনেকেই; কিন্তু জগতের মধ্যে বাস্তবের জীবনের ক্ষেত্রে সেই আধ্যাত্মিকতা মুক্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন কয়জন, কোথায় ও কি ভাবে ইহাই জিজ্ঞাস্য। অধ্যাত্মে যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উন্নীত, তাঁহাদেরও চেতনা বহিঃপ্রকাশের সময়ে মনের রূপে ও রঙে আকার লইয়াছে রঙীল হইয়াছে। বাহ্য সৃষ্টি করিতে গিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানসিক আদর্শে পরিণত হইয়াছে, প্রাণের ও দেহের স্বাভাবিক ধর্ম ও রীতিকে আশ্রয় করিয়া বাস্তবে রূপ লইতে চাহিয়াছে। আধ্যাত্মিক সত্যটি তাঁহাদের প্রয়াসের পিছনে থাকিতে পারে, কিন্তু গোণভাবে সম্মুখে মুখ্য হইয়া দেখা দিয়াছে নন প্রাণ দেহ সেই সত্যটি যে প্রকারে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে। অন্য কথায়, তাঁহারা অধ্যাত্মের একটা দিক দেখিয়াছেন অধিগত করিয়াছেন, যেটি হইতেছে সাধারণ, সীমাহীন এবং যাহার গতি অব্যক্তের দিকে, স্থিতি অব্যক্তেরই মধ্যে; কিন্তু অধ্যাত্মের আছে আর একটা দিক, যাহা বিশেষ, স্ফীত, বহু যাহার প্রেরণা, আত্মপ্রকাশের জন্য, বস্তু-জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য। প্রাচীনেরা অধ্যাত্মকে চাহিয়াছিলেন ব্যবহারকে বিসর্জন দিয়া অন্ততঃ একটা গোণ উপায়রূপে ধরিয়া; তাঁহাদের সাধনা ছিল কি করিয়া নীচে হইতে উপরে উঠা যায়, বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু উপর হইতে কি করিয়া ফিরিয়া আবার অবতরণ করা যায়, ভিতর হইতে আবার বাহিরে কি প্রকারে আসা যায় সেই কৌশল অভিমত্যুর মতনই তাঁহারাও জানেন

দেবজগৎ

নাই, বা জানিবার প্রয়োজন নেন করেন নাই। আর এই কৌশল জানা না থাকিলে দেহ প্রাণ মনকে রূপান্তরিত করা যায় না—বস্তু-জগতে, জীবনের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মকে পূর্ণ মূর্ত্ত করিয়া তোলা যায় না ; দেহ প্রাণ মনের অতীত হওয়া যায় বটে কিন্তু জাগ্রত চেতনায় কর্ত্ত জীবনে নামিয়া আসিলে ইহাদেরই কবলে একভাবে না একভাবে পড়িতে হয়। দেহ প্রাণ মনের 'শুদ্ধি' এক কথা, কিন্তু রূপান্তর আর এক কথা। শুদ্ধিতে বস্তুর আসল রূপ বা গড়ন পরিবর্তিত হয় না—হয় শুধু তাহাকে পরিকার পরিচ্ছন্ন মাজাঘষা, সভ্য-ভব্য করিয়া তোলা। রূপান্তর অর্থ আকার প্রকারের পরিবর্তন, চলন বলনের পরিবর্তন—একরকম বস্তুরই পরিবর্তন। বোলা জল পরিকার করা এক কথা আর তাহাকে জমাইয়া বরফ করা বা তাপ দিয়া বাষ্পে পরিণত করা আর এক কথা। বাষ্প, জল, বরফ মূলতঃ এক পদার্থ হইলেও, রূপান্তরের ফলে তাহারা ভিনুধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের আধারে দিব্য প্রকৃতির প্রকাশ, পৃথিবীতে দেবতার অবতরণ সব দেহ প্রাণ মনের এই রকম একটা আগুল রূপান্তরের, একটা ধর্ম্ম বিপর্যয়েরই কল্যাণে।

সমাজ শরণ গচ্ছামি

অনেকে বলিয়া থাকেন সমাজকে আগুল সংস্কার করিতে হইলে, নুতন বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে, প্রথমে ও শেষে বরাবর দৃষ্টি দিতে হইবে ব্যক্তির উপর, ব্যাষ্টগত উন্নতির উপর। শুধু তাই নয়, আগে দল বাঁধিবে না, সমাজ মণ্ডলী কিছু গড়িবে না—গোড়ায় প্রত্যেক ব্যক্তি (অন্ততঃ কয়েকজন ব্যক্তি) যাহাতে আপন আপন স্বাধীন স্বতন্ত্র পথে, যাহার যেমন সার্থকতার তাগিদ সে সেই অনুসারে অবাধে চলিয়া যাইতে পারে, এই ব্যবস্থা করিয়া দাও; ব্যাষ্ট হিসাবে যখন তাহার সার্থক হইবে, তখন এই সকল ব্যাষ্টের সমবায় আপনা হইতে যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহাই হইবে আদর্শ সমাজ।*

প্রথম কথা এই, মানব-সমাজের যে রকম গড়ন, মানব জাতির যে প্রকৃতি তাহাতে দেখি সেখানে ব্যাষ্টের সহিত সমষ্টির কোথাও সরাসরি সম্বন্ধ নাই, সর্বদা সর্বত্র উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া কোন না কোন গোষ্ঠী দাঁড়াইয়া আছে। পূর্বপ্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি মানুষ দল বা সমাজ গড়ে সম্ভানে, সমাজ গড়ে অজ্ঞানে। কিন্তু সমাজ বলিলেও কেবল পৃথক পৃথক ব্যাষ্টের সমবায় বুঝায় না। পশু-সমাজে যেমন আছে pack বা herd—পাল, ঝাঁক, যুথ—সেই রকম শুধু দেহ প্রাণ লইয়া মানুষের যে আদীন সমাজ সেখানেও আছে গোষ্ঠীবদ্ধন। পরিবার, কুল, গোত্র—মূলতঃ এই ধরণেরই জিনিষ। তবে এই শ্রেণীর গোষ্ঠী সমাজেরই আপন

* ইদানীং Count Keyserling এই ধরণের আদর্শ প্রচার করিয়া ইউরোপে নদীদ্বী মহলে বেশ সোরগোল তুলিয়াছেন। তাহার কথা আমরা পরের প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিব।

দেবজ্ঞান

সহজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইহাদিগকে বাদ দিয়া সমাজ হইতে পারে না। মনের আবির্ভাবে মানুষ এই সকল প্রাকৃত গোষ্ঠিকে নূতন প্রয়োজন অনুসারে এদিক ওদিক পরিবর্তিত করিয়া লয়, অথবা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গোষ্ঠি ইচ্ছামত গড়িতে চেষ্টা করে। পশুর যে herd-instinct তাহাই রূপান্তরিত হইয়া সম্ভবদ্বিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং মানুষ পারে পছন্দ করিতে কোন্ দলে সে প্রবেশ করিবে বা না করিবে, অথবা যদি সামর্থ্য ও প্রতিভা থাকে কোন দল গড়িবে বা না গড়িবে; কিন্তু আদৌ কোন দলভুক্ত হইব না, এই সংকল্প অনুসারে কার্য্য করা সহজসাধ্য নয়, অসম্ভব: এইপ্রকার free-lance এর স্থান সমাজে হয় না—আমাদের দেশে free-lance যাহারা হইতে চায়, তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হয়, বনবাগী হইতে হয়।

উত্তরে বলা যাইতে পারে, গোষ্ঠি বা দল গড়া বাস্তবিকই হইতেছে প্রাকৃত মানুষের ধর্ম; মনের ধর্ম নইয়াও যদি মানুষ দল ছাড়া চলিতে না পারে তবে তাহার অর্থ মনের মধ্যে সে দেহ প্রাণেরই জের টানিয়া চলিয়াছে। মানুষ সমাজের মধ্যে খণ্ড-সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে ব্যক্তিগত স্বার্থ স্ববিধা স্বার্থ, দেহপ্রাণের তাগিদ মিটাইবার স্ববন্দোবস্ত হয় বলিয়া। কিন্তু এটি গেল মানুষের “সামান্য”-ধর্মের দিক, যে ধর্ম সমানভাবে সকল মানুষের বর্তমান; কিন্তু মানুষের আছে আবার একটা ‘অসামান্য’ দিক, অন্তরের দিক, যেখানে মানুষ চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে, স্নানরকে মহৎকে গড়ে, সেখানে প্রত্যেক মানুষ আলাদা আলাদা, প্রত্যেক মানুষের আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, একান্ত আপনার চরিতার্থতা।* মানুষের মধ্যে এই যে সমাজ, যাহার মঙ্গল হইতেছে “একলা চল রে,” তাহাই মানুষের গভীরতম, শ্রেষ্ঠতম চেতনা। মানুষে মানুষে বৈচিত্র্য এই এখানেই; এবং যে সমাজে, যে গোষ্ঠিতে এই বৈচিত্র্য বিকাশের

* মুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, আত্মশক্তি, ১১ই চৈত্র, ১৩৩১ (“কুড়োন পত্র”)।

অবকাশ যত কম তাহা তত অনুন্নত, তত উৎপীড়ক—তাহার প্রসার ও জীবনকাল তত সঙ্কীর্ণ।

অন্তরের আদর্শের সাধনা মানুষের অসামান্যের দিক। একেত্রে মানুষকে যথাসম্ভব একলা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; দল গড়িয়া সম্ভবদ্বয় হইয়া যে সাধনা তাহার বিরুদ্ধে মোটামুটি এই অভিযোগ আনা যাইতে পারে :—

(১) দল অর্থে একটা বিশেষ আদর্শ—তাহার আছে বিশেষ লক্ষ্য, বিশেষ উপায়; তাহা একটা বিশেষ ছাঁচ। হয়ত কোন বিশেষ ব্যক্তি নিজেরই প্রয়োজন অনুসারে সেটি গড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং তেমন জিনিষ মানুষ মাত্রেই কাজে ব্যবহারে আসিতে পারে না, মানবজাতির সকলের, এমন কি, অনেকের চরিতার্থতা সার্থকতা তাহাতে সম্ভব নয়; (২) দলের প্রত্যেক ব্যক্তিরও পূর্ণ সার্থকতা হয় না—দলবদ্ধ হওয়া অর্থই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অনেকখানি খাটো করা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে খাটো করা অর্থ নিজের মধ্যে যিনি ব্রহ্ম তাঁহাকে খাটো করা; (৩) দল হইতেছে দল মাত্র অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ অস্থায়ী; বিশেষ দেশ বিশেষ কাল বিশেষ পাত্র লইয়া দল, তাহা পাকা জিনিষ কিছু নয়, তাহার মধ্যে সনাতন সার্বভৌমিক সত্য থাকিতে পারে না।

এ সকল কথার মূলে রহিয়াছে একটি কথা—স্বাধিকার-প্রমত্ততা, যাহার নোহে পড়িয়া মানুষ মনে করে তাহার স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সর্বদা সর্বত্র নানা কাঁদ পাতা হইয়াছে—আর সকলের চেয়ে কঠিন কাঁদ হইতেছে গোপ্তি।

কিন্তু ব্যাপ্তি ও গোপ্তির মধ্যে এই যে একটা নৈসর্গিক স্বন্দর কল্পনা করা হইয়াছে তাহা কতখানি সত্য? আর আপন ব্যক্তিত্বকে চরন করিয়া ফলাইয়া ধরা হইতেছে পরম পুরুষার্থ, এ কথার অর্থই বা কি?

ব্যক্তিবোধ জিনিষটা আদৌ কি? আসিল কোথা হইতে? প্রাকৃতিক বিবর্তনের দিক দিয়া দেখিলে এখানেও দেখি, সমাজের আদিম

দেবজন্ম

অবস্থার, অর্থাৎ শুধু দেহ প্রাণের দাবি মিটাইবার জন্য যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মানুষের এই বৃত্তিটি পরিস্ফুট সজাগ ছিল না। মানুষের ব্যক্তিবোধ, ব্যক্তিগত মর্যাদা তত দেখা দিয়াছে, মানুষের মানসিক চেতনা যত বিকশিত হইয়াছে। সমাজের প্রথম যুগে গোষ্ঠী-জীবনই ছিল প্রধান কথা, সমাজের মানুষ তাহার ব্যক্তিগত সমস্ত জীবন ঐ সমষ্টির জীবনের মধ্যে ঢালিয়া নিশাইয়া দিয়াছে, ব্যক্তি তাহার জীবনের ছক আঁকিয়াছে গোষ্ঠীর সার্থকতার দিকে তাকাইয়া, গোষ্ঠীগত সার্থকতার বাহিরে ব্যক্তিগত সার্থকতা একরকম ছিলই না। কিন্তু মনবুদ্ধির প্রকাশ যেমন হইয়াছে, অর্থাৎ অপ্রাকৃত বা অসামান্যের দিকটা যেমন খুলিতে সুরু করিয়াছে তেমন মানুষ তাহার প্রাকৃত প্রকৃতি ও প্রাকৃত প্রকৃতির ক্ষেত্র যে গোষ্ঠী তাহার বিরুদ্ধে মুখ ফিরাইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তিত্ব হইতেছে তাই একটা প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র। ব্যক্তি তাহার সজ্ঞান জীবন অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব পাইয়াছে বাহাতে সজ্ঞানে নিজেকে সে গড়িয়া তুলিতে পারে; যার গোষ্ঠীতে জীবনও বাহাতে পরিবর্তিত করিয়া সজ্ঞানে গড়িয়া তুলিতে পারে। প্রাকৃতিক বিবর্তনেও শ্রেণী speciesই কেন্দ্র বা লক্ষ্য—শ্রেণীতে পরিণতি উন্নতি ঘটাইবার যত্ন বা আশ্রয় মাত্র হইতেছে ব্যক্তি বা individual.

কিন্তু ব্যক্তিবোধই মানুষের চরম বা শেষ কথা নয়। “অসামান্য” বা আমরা যাহাকে বলিতেছি প্রাকৃত তাহার একটা অংশ বা পৈঠা হইতেছে ব্যক্তিত্ব। আমরা অতিপ্রাকৃতের কথা বলিয়াছি, মানুষের বর্ষ্য সেখানে “অসামান্য” বলিব না, বলিব, “অতি-সামান্য”—সেখানে ব্যক্তিবোধ ছাড়াইয়া গিয়া পাইয়াছি ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা বৃহত্তর গভীরতর একটা সত্তা। সেখানে আমি একলা দাঁড়াইয়া নাই, অনেককে লইয়া অনেকের মধ্যে আমি সেখানে সার্থক। ব্যক্তিত্ব জিনিষটা প্রথমেও ছিল না, পরেও থাকিবে না—তাহা ব্যক্ত শুধু মর্যাপথে।

মনের স্তরে উঠিয়া মানুষ বখন সজ্ঞান হয়, তখন যে সত্যটি সে নিবিড়ভাবে অনুভব করে, যে প্রত্যয়টি সকলের চেয়ে বড় হইয়া সর্ব-সর্ব হইয়া দেখা দেয় তাহা হইতেছে দুর্বাসা মুনির সেই “অমমহন্তোঃ”—আমি আছি, আমি আছি, আর কেহ আছে কি না, কিছু আছে কি না জানি না বুঝি না—চাই আমার চরিতার্থতা, আমারই স্বাধীন গতি স্বতন্ত্র সিদ্ধি, আমারই একান্ত সার্থকতা। তাই দেখি মানুষের যে যুগ সকলের চেয়ে বেশী মানসপ্রত্যয়-প্রতিষ্ঠ বা যুক্তিবাদী (rationalistic) তাহাই ডেনোক্রাসীর যুগ অর্থাৎ তখন সমবেত জীবনে প্রত্যেকে চাহে নিজস্ব জীবনযাত্রার অবাধ নিরঙ্কুশ অবকাশ ও অধিকার। মনের চেতনায় এই যে ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইতেছে আত্মরিক ব্যক্তিত্ব—অন্য কথায় অহংকার।

মানস নিরস্ত্রিত দেহ প্রাণের গভীর মধ্যে আত্মচরিতার্থতাকে চরম করিয়া দেখাই হইতেছে অস্তরের বর্ষ। এই ধরণের অস্তরেরা নিলিয়াই গোষ্ঠীজীবন সাধারণতঃ গড়িয়াছে, তাই ত সমাজ দেখি অন্তর্ভুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। আর এইজন্যই মানুষের সম্মিলিত জীবনে, সমাজে হউক আর সম্ভে হউক, অবাধ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে না, উঠিতে পারে না—প্রত্যেক অস্তরের চূড়ান্ত দাবি মিটাইতে হইলে সমাজ বলিয়া কোন জিনিষ টিকিতে পারে না। সাধারণতঃ তাই সামাজিক জীবনে যে শাস্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় তাহা কার্যতঃ হইতেছে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ বা ব্যক্তিপরায়ণতার মধ্যে কোন রকম রক্ষা, জোড়াতালি। ঠিক এই জন্যই দেখি যে যুগে ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্ব অত্যধিক ফলাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ একান্ত ডেনোক্রাসীর যুগে, সমাজ রক্ষার জন্য সমাজের ভিতরে অনিবার্যভাবে প্রতিক্রিয়ার চেউ উঠিয়াছে—সে চেউএর নানা নাম নানা রূপ—Socialism এক, Fascism আর এক।

দেবজগৎ

মানুষের সত্যকার নিজস্ব আছে, সে নিজস্বের পরিপূর্ণ সার্থকতাও আছে কিন্তু এ জিনিষটিও মনের ঐ ওপারে,—এখানেও বলি, নেদং যদিদমুপাসতে। মনের মধ্যে সজ্ঞান হইয়া মানুষ ব্যক্তি হিসাবে যে সার্থকতা চাহিতেছে তাহা আর এক স্তরের আর এক ধরণের ব্যষ্টি-সার্থকতার প্রতিচ্ছবি মাত্র।

মনের উপরে মানুষের আছে এক দৈবী ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের অর্থ জীবের সত্য-স্বরূপ, ভগবানের ব্যষ্টিগত নিত্যরূপ। অহংকারের মধ্যে নয়, কিন্তু অহংএর উপরে যে মহলোক (সাংখ্য) সেখানেই মানুষ পাইয়াছে তাহার চরম অর্থাৎ সত্যকার নিজস্ব বা ব্যক্তিত্ব। এখানে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে প্রতিযোগিতা নাই, আপন স্বাধীন স্বতন্ত্র সভা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্যষ্টিকে সর্বদা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসজ্জিত বর্ষপরিহিত হইয়া থাকিতে হয় না। পরের সহিত পার্থক্য-বোধেরই উপর এখানে আশ্রবোধ প্রতিষ্ঠিত নয়—এখানে প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত ‘স্বৈ মহিগ্নি’। আবার প্রত্যেকেই আপনাকে ও অপরকে দেখে একই বৃহৎ সত্যের বিচিত্র প্রকাশরূপে—সকলকে দেখে আপনার মধ্যে, আপনাকে দেখে সকলের মধ্যে—পরস্পরং ভাবযন্তুঃ।...

বৈদিক ঋষিরা দেখিয়াছেন, দেবসনাজে বিশ্বদেবতা অর্থাৎ সকল দেবতা মিলিয়া হইতেছেন এক অখণ্ড দেবতা; প্রত্যেক দেবতার আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, এই আপন আপন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া প্রত্যেক দেবতাই চরম চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ; কিন্তু প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত সকলের সমবেত বৈশিষ্ট্যের উপর—প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই আছেন অন্যান্য দেবতা।*

* ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই ব্যাপারটি সত্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাই ইহাকে Henotheism এই নাম দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

অতিনানসে এই যে দেব-সমাজ তাহাই হইতেছে মানব-সমাজের আদি ও সত্য স্বরূপ (archetype বা prototype)। ইহারই একটা স্মৃতি মানস চেতনায় যেমন প্রতিকলিত হইয়াছে, তেমনি তাহার আলোকে কোন আদর্শের অনুসরণে মানুষ নূতন সমাজ অর্থাৎ সম্বৎ রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অথবা পূর্বের আনন্দ যে অবতরণের কথা বলিয়াছি, সেই কথার বলিতে পারি, উপরের দেবসম্বৎ তাহার গোপ্তিগত গোটা প্রতিষ্ঠান লইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইতে চলিয়াছে এবং এই অবতরণের চাপে মানুষের মানসক্ষেত্রে যে নানা জল্পনা কল্পনা জাগিয়াছে, যে সকল মহলা পরীক্ষা চলিয়াছে তাহারই নিদর্শন হইতেছে নানা স্থানের নানা যুগের নানা ভাবের দল বা সম্বৎ।

মানব-সমাজে যখন নূতন একটা ব্যবস্থার পদন হয়, তখন গোড়ায় তাহা একটা বিশেষ মণ্ডলীকে ধরিয়া সুরু হয়। মুষ্টিমেয় লোকের বিশেষ সঙ্কল্প ও সাধনাই প্রচারিত প্রসারিত হইয়া বহুর সামান্য ধর্ম হইয়া উঠে। এই সঙ্কল্প ও সাধনা চলিত সংস্কারের গতানুগতিক অভ্যাসের যত বিরুদ্ধে চলিতে চায়, সেই অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণের ও উপযুক্ত প্রকারের শক্তি অবশ্যই আহরণ করিতে হয়; কিন্তু তাহা পৃথক পৃথক ব্যষ্টির বিভিন্নমুখী চেষ্টার ভিত্তর দিয়া হয় না কিম্বা বহুজনের সর্বসাধারণের প্রত্যেকের আপন আপন কল্পিত সার্থকতার ব্যবস্থাও তাহা করিতে পারে না।

যে সাধনার লক্ষ্য মানুষের স্বভাবকে আনন্দ পরিবর্তন করা, তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দাঁড়াইয়া—প্রাকৃতকে প্রাকৃত দিয়া জয় করা যায় না, প্রাকৃতকে জয় করিতে হয় অতিপ্রাকৃতের একটা বিশেষ বৃহৎ সত্য দিয়া; যে মণ্ডলীর মধ্যে এই প্রচেষ্টা অবতীর্ণ, তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই এক লক্ষ্যে “শরৎ তন্ময়” হইয়া যাইতে হইবে। সেখানে ব্যষ্টির সাহায্য ও মহিমা ঘোষণা করিয়া, প্রত্যেকের “সামান্য”

দেবজন্ম

“অসামান্য” সকল রকম সার্থকতার মৌরসী অধিকার (inalienable right) দাবি করিয়া আপন আপন স্বতন্ত্র সার্থকতার যে খুঁজিবার চেষ্টা তাহার অর্থই হইতেছে প্রাকৃতশক্তিকে সাহায্য করা, লক্ষ্যকে ব্যাহত করা। এই রকম গোপ্তির ন্যে ভোগী যদি তাহার ভোগের সামগ্রী না পায়, কবি যদি স্বপ্ন রচিবার অবসর না পায়, দার্শনিক যদি বাদবিচার যুক্তিতর্ক করিতে উৎসাহ না পায়, কিম্বা দেশভক্ত যদি চরকা চালাইবার সুযোগ না পায়, তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ব্যাপ্তিবৈচিত্র্যের দোহাই দিয়া সেই গোপ্তির উপর দোষারোপ করা সুবুদ্ধির পরিচয় নহে। স্বাতন্ত্র্য অর্থ স্বৈচ্ছাচার বা স্বাধিকার-মত্ততা নয় পরন্তু আপনার শ্রেষ্ঠতম গভীরতম ‘স্ব’কে পাইতে হইলে চাই কঠোর সংযম শাসন, এমন কি, একটা বেপরোয়া আত্ম-বিসর্জন।

অবশ্য সমস্ত মানবজাতির প্রত্যেক কিম্বা অধিকাংশই দেশকাল-পাত্রনিবিশেষে যে একই সাধনার সাধক হইবে, সে সাধনা যতই উদার ও সার্বভৌমিক হউক না কেন—এমন কোন কথা নাই। কোন গোপ্তির কোন সমাজের কোন আদর্শ বা লক্ষ্য সম্বন্ধে মুখ্যতঃ বিশ্বমানবের জন্য হইতে পারে কিনা সন্দেহ। তাই বলিয়া গোপ্তিবন্ধন নিরর্থক হয় না, আদর্শের চর্চা, সাধনা একান্ত ব্যর্থ হয় না। গুণ ও কর্ম, সাধনা ও সিদ্ধির ধারা অনুসারে সমাজ গোপ্তিতে গোপ্তিতে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, আর সকল গোপ্তির চুড়ায় একটা পরমসুন্দর অনবদ্য মানবরূপী দেবতার সম্মুখ গড়িয়া উঠিবে ইহাও খুব আশ্চর্যের নয়। কোন সমাজে কোন গোপ্তিতে তুমি তোমার সার্থকতা লাভ করিবে, তাহা বাছিয়া বরণ করিয়া লইবার অধিকার তোমার আছে, কিম্বা চাও যদি তোমার যথেষ্ট স্বতন্ত্রমার্গে একলাই উন্মার্গগামী হইয়া চলিতে পার; কিন্তু তোমার নিজের ধর্ম কর্ম ছাড়া, তোমার নিজের “স্ব স্ববিধা সার্থকতা” যে দলে বা সমাজে তাহা ছাড়া আর সব কাঁচা খুঁটা, এই সরাসরি রায় দিবার অধিকার তোমার নাই।

বুদ্ধৎ শরণং গচ্ছামি

ভেগোক্রাসীর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, যুক্তিবাদের যুগে আমরা আর একটা জিনিষ উড়াইয়া দিয়াছি, তাহা হইতেছে মহাপুরুষের মাহাত্ম্য। ব্যষ্টির অর্থাৎ নিজের নিজের মাহাত্ম্য আমরা এতখানি অনুভব করিয়া ফেলিয়াছি যে কাহারও কাছে মাথা অবনত করা, কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করা, পূজা করা আর আনাদের খাতে সহ্য না। যুক্তিটা এই,* মানুষে মানুষে যে ভেদ তাহা কেবল বাহিরের, কেবল অবস্থাচক্রের ইতর বিশেষ, আসল কোন ভেদ নাই। সকল মানুষই শিক্ষা পাইলে স্বযোগ পাইলে সমান পদে উন্নীত হইতে পারে। মানুষ পাপী কারণ সে তাপী—অভাবে স্বভাব নষ্ট; অবস্থা বুঝিয়া দাঁও খোর নারকীও সাধু হইয়া উঠিবে। মানুষ বড় ছোট উচ্চ নীচ করিয়া ভাগ করা প্রাচীন জাতি বা বর্ণভেদের কুসংস্কার মাত্র। অবশ্য মানুষ মানুষের শিক্ষক হইতে পারে, নেতা হইতে পারে—কিন্তু কোন নৈসর্গিক বা বিবিস্তৃত গুণে নয়, ইহা শুধু সুযোগ সুবিধা ঘটনাচক্রের কথা মাত্র। আজ তুমি শিক্ষক, কাল আমিও শিক্ষক হইতে পারি; এক বিষয়ে তুমি নেতা আমি নীত, অন্য বিষয়ে আবার তুমিই নীত আমিই হয়ত নেতা। সমাজ বন্ধনের মূলমন্ত্র হইতেছে যে মস্ত্রে রুশো ফরাসী বিপ্লবের বীজ বপন করিয়া

* ভাইয়া (Comrade) শব্দগুণালা এই সেদিন গাঁধীজীকে এক হুদৌষ বক্তৃতা দিয়া সমঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গাঁধীজীর সকলের চেয়ে বিষম অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইতেছে এই যে দেশের লোক তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করে, তাঁহার পায়ের ধূলা মাখায় দেয়। আর একজন “গুরু দশায়” পড়িয়া বলিতেছেন, “মানুষের পূজা করিতে করিতে মনুষ্যত্ব লোপ পাইল আমাদের।”

দেবজন্ম

গিয়াছিলেন—men are born equal, সব মানুষ সমান, মানুষের ইহা জন্মগত অধিকার। শিক্ষার অভাবে পদের অভাবে অপের অভাবে কেহ যদি পিছুইয়া পড়িয়া থাকে তবে সেই জন্যই তাহার নর্যাদার হ্রাস হইবে, তাহাকে অন্ত্যজ শ্রেণীতে নাম লিখাইতে হইবে, এই শাস্ত্র পৃথিবীতে আর চলিবে না। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন সবল দুর্বল (সাধু অসাধু পর্য্যন্ত আজকালকার নাটক নভেলের কথা) সকল মানুষ মানুষ হিসাবে এক আভিজাত্যে মণ্ডিত। স্মৃতরাং দাস কেহ কহিরাও নয়,—“সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান।” কাহারও পদতলে মাথা নত করা অর্থ আপনাকে দীনহীন অধম বিবেচনা করা, আপন মানুষকে খর্ব করা, নিজেরই অন্তরস্থ ভগবানকে অপমান করা। করাসী বিপ্লবের সময়ে রাজাগজা হইতে চাঘাভুয়া সকলেই ছিলেন “বাসী” (citizen) ; আর আজকাল রুণ বিপ্লবের পরে সবাই হইতেছেন “ভাইয়া” (comrade) ।

কেহ কাহারও তাঁবেদার নয়, প্রত্যেকেই স্বরাট। পরস্পরের সাধে যদি আমরা মেনামেশা করি, অনেকে একত্র হইয়া যদি দল গঠন করি তবে তাহার একমাত্র হেতু প্রত্যেকের নিজের নিজের সুখ সুবিধা সার্থকতার স্বযোগ। পরের আওতার থাকিয়া যখন মানুষকে চলিতে হয়, তখন সে নিজের সত্যকে পায় না, ভরাবহ পরধর্মে অনুসরণ করিয়া ইতো নষ্ট স্তোত্রো ব্রষ্ট হইয়া পড়ে। ব্যাষ্টিস্থাতন্ত্রের নূতন পুরোহিত* তাই বলিতেছেন : “ব্যাষ্টি হিসাবে প্রত্যেক মানুষটিরই উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে। প্রথমে চাই এমন কয়েকজন ব্যক্তি যাহারা নিজের নিজের জীবন-সমস্যা সমাধান করিয়াছে। এই ধরণের লোকের

(২) কেইসেরলিং। মূল হইতেছে জর্জরুণ, আমার কাছে আছে ফরাসী অনুবাদ। তাই আমি এখানে কেবল বাংলা তর্জমাই দিলাম—লেখক।

সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণ হইলে তবে তাহাদের দিয়া সমষ্টি-জীবনের সত্যাকার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবে। এই ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা অনুসন্ধিৎসা বাহাতে বুদ্ধি পায় তাহাতে মৎসামান্য সহায় হওয়া ছাড়া আধ্যাত্মিক দিশারীর আর বেশী কিছু করিবার নাই। প্রত্যেককে নিজের পথ নিজে আবিষ্কার করিতে হইবে—এক জনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ভার আর এক জন কখন লইতে পারে না। বর্তমানে আমরা যে সন্ধির যুগে উপস্থিত, এখন প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হইতেছে ব্যক্তিগত স্বাভাব্য বাড়াইয়া তোলা।”

রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাজার রাজত্ব করিবার যেমন আর ভগবৎদত্ত অধিকার নাই, ধর্মের ক্ষেত্রে সেই রকম গুরু অধিকারও বাতিল হইয়া গিয়াছে—মোনিয়ের-এর ডাক্তারটির মত সে সবই আমরা উল্টাইয়া দিয়াছি (Nous avons changé tout cela)। রাজা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নেতা এখন হইতেছেন প্রজার প্রতিনিধি, প্রজারাই কাজের সুবিধার জন্য তাঁহাকে নির্বাচন করিয়া উচ্চাসনে বসাইয়াছে—প্রজারা ইচ্ছা করিলে প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে টানিয়া নামাইতে পারে, আর এক জনকে বসাইতে পারে। শিক্ষাদীক্ষার নেতাও হইবে সেই ধরণের, সুবোগ সুবিধা লাভ-যাহার যেখানে যেমন সে তথায় যাইবে, আর আজকালের শিক্ষাদীক্ষা যে জটিল যে বহু বিচিত্র অনুষ্ঠান তাহাতে একজন নয়, প্রয়োজন বহু গুরু, একটা গোটা বা একাধিক আরতন। কিন্তু সকল ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর, ব্যক্তিরই প্রয়োজনের দ্বারা গঠিত নিয়ন্ত্রিত। তদ্ব্যতীত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আছে শুধু একটা চুক্তির সম্বন্ধ—একটা বিশেষ বিদ্যার আদান প্রদানের মধ্যেই উভয়ের সম্বন্ধ নিঃশেষিত, ঐটুকুর বাহিরে উভয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, যদৃচ্ছাচারী। গুরু শিষ্য আর নাই, আজ কাল হইতেছে মাষ্টার ছাত্র।

গুরুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে গুরু শিক্ষা ও দীক্ষা দান করেন

দেবজ্ঞান

বটে কিন্তু বিনিময়ে চাহেন শিষ্যের তনু মন ধন, শিষ্যের আত্মবলি, ব্যাট্ট স্বনাশ। শ্রেষ্ঠ শিষ্য তিনি যিনি গুরুর নির্ভুল প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ গুরুর প্রেত ছায়া। শক্তিনান মহাপুরুষ আসেন, শিষ্যদল গঠন করেন মুখ্যতঃ নিজের সার্থকতার জন্য—সকল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে যথাসম্ভব পদদলিত করিয়াই তিনি তাঁহার নিজেকে জাহির করেন। শিষ্যবর্গ হইতেছে গুরুর আধ্যাত্মিক আহার—আধুনিক ভাষায় গুরুর নাম ‘ভাম্পায়ার’ (vampire) * ।

গুরুকে মহাপুরুষকে লইয়া আধুনিক “স্বাধীন-বাদী”রা এই যে মতবাদ বা থিওরী খাড়া করিয়াছেন ইহা স্বীকার করিতে প্রথমে আর কোন বাধা নাই, এক বাস্তব ঘটনা ছাড়া। শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু ছিলেন, মহাপুরুষ ছিলেন—তাঁহার কাছে নিজেকে বিকাইয়া দিয়াছিলেন বিবেকানন্দ; রামদাসের দাসানুদাস ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। এখন, বিবেকানন্দের বা শিবাজীর স্বাতন্ত্র্য ছিল না, তাঁহাদের ব্যাট্টস্বের কিছু অপচয় ঘটিয়াছিল, এমন কথা কোন “ব্যাট্টস্ববাদী” দুঃসাহস করিয়া বলিতে পারেন? পক্ষান্তরে, বলিব না কি আত্মবলি দিয়াই এই বীরদ্বয় তাঁহাদের সত্যকার বীর সত্তাকে লাভ করিয়াছিলেন?

প্রতিপক্ষ উত্তর করিতে পারেন, বিশেষ মহাপুরুষের প্রভাব বিশেষ ব্যক্তির উপর অপকারজনক নাও হইতে পারে; কিন্তু সাধারণভাবে মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে আসিয়া বেশীর ভাগ লোকই হইয়া পড়ে অন্তঃসারশূন্য সেরুদণ্ডহীন অসহায় যন্ত্র মাত্র—গুণু প্রতিশ্রুতি, গুণু অনুকরণ—জড়ভরত। সাধারণভাবে মহাপুরুষদের প্রভাব না হয় এই রকমই

* “প্রতি মানুষের অন্তরে যে ভগবান বিশেষ সম্ভার সত্য হইয়া আছেন তাঁহাকে দাঁত করিয়া গুরু ভগবান হুত্বার দিকে মানুষকে লইয়া চলিয়াছেন।” শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র রায়, “গুরুর দগ্ধা” উত্তরা আধিন, ১৩৩০।

হইল—আপাততঃ তাহার বিচার করিব না ; কিন্তু অসাধারণভাবে মহাপুরুষদের প্রভাব অন্য রকমের হয় কেন, এই প্রশ্নটির একটা সদুত্তর প্রয়োজন। সাধারণ হইলেও বাহ্য হইতেছে বিকৃত বা ভেজাল তাহা না বরিয়া, অসাধারণ হইলেও বাহ্য হইতেছে প্রকৃত বাহ্য খাঁটি তাহার অনুসরণে চলা উচিত।

কথাটি হইতেছে এই। জগতে কোন বস্তু আহরণ করিতে হইলে তাহার মূল্য দিতে হয়। আর এই মূল্য অর্থই হইতেছে আত্মত্যাগ। তাই গীতা বলিতেছে সমস্ত স্রষ্টাই হইতেছে একটা বিরাট বজ্র অর্থাৎ আত্মোৎসর্গের ব্যাপার। তবে এই আত্মোৎসর্গের মাত্রা ও ধরণ নির্ভর করে তুমি কোন মাত্রার ও ধরণের জিনিষ আকাঙ্ক্ষা কর তাহার উপর। অন্য কথায়, এক আত্মা তুমি বলি দাও আর এক আত্মা পাইবার জন্য ; এক সীমায় হয়ত তুমি যে আত্মাকে উৎসর্গ কর তাহা হইতেছে শুধু অর্থই বা মুদ্রাখণ্ড, আর এক সীমায় তোমাকে হয়ত বলি দিতে হয় তুমি যেটিকে তোমার নিজস্ব তোমার সত্যকার আত্মা বলিয়া বিবেচনা কর। আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে তুমি উচ্চতর সত্যের তোমার সত্যতম আত্মার সাধক, সেখানে তোমার আত্মবলির মাত্রাও চরম চূড়ান্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

এখানে আপত্তি হইতে পারে, আত্মবলির প্রয়োজন না হয় স্বীকার করিলাম ; কিন্তু সে আত্মবলি আর একজন আমারই মত মানুষের কাছে দিতে হইবে কেন ? সত্যের জন্য অপর এক মর্ত্যজীবের পায়ে দাসখত লিখিয়া দিতে হইবে কেন ? আমি কি নিজের আলোকে নিজে চলিতে পারি না, নিজের সত্য নিজে আবিষ্কার করিতে পারি না ? আত্মবলি দিতে হয়, নিজের উচ্চতর আত্মার কাছে নিজের নিম্নতর আত্মাকে আমি নিজেই বলি দিব—আত্মনা আত্মনাং উদ্ধরেৎ ; এই আত্মসাধনার ব্যাপারে বাহিরের একজন মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে,

দেবজন্ম

কিন্তু তাহার কাছে নিজেকে লোপ করিয়া তাহাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলিতে হইবে কোন প্রয়োজনে?

কারণ, সত্য পৃথিবীতে প্রকট হয় মানুষী রূপ ধরিয়া—সম্ভবানি যুগে যুগে। সত্য আকাশে বাতাসে বে-ওয়ারিশ ভাবে উড়িয়া চলিয়াছে যাহার খুসী সেই তাহাকে ধরিয়া কেনিতে পারে—ব্যাপারটি সব সময়ে এত সহজ সরল নয়। সত্যের মানুষ যাঁহারা, যাঁহারা সত্যকে সোজা-সুজি আয়ত্ত করিবার অধিকার রাখেন তাঁহাদেরই নাম বিভূতি, অবতার, মহাপুরুষ, গুরু। অবশ্য এমন সত্য আছে যাহার জন্য আর কাহারও শরণাপন্ন হইতে হয় না, নিজের ভিতর হইতেই নিজে তাহার সন্ধান আমরা পাই—তাহা হইল দেহের ও প্রাণের সত্য, আহার নিদ্রাদি। আবার এমন সত্য আছে যাহা পাইতে হইলে অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয় বটে, কিন্তু বিশেষ কোন ব্যক্তির কাছে নয় অথবা শুধু সাহায্য ছাড়া আর বেশী কিছুই জন্মোৎপত্তি নয়—মনের সত্য এই ধরনের, বিদ্যাশিক্ষাদি। কিন্তু এমন সত্যও আছে যাহা লাভ করিতে হইলে ব্যক্তি বিশেষ ছাড়া, ব্যক্তি বিশেষের প্রসাদ বা করুণা ব্যতীত গতি নাই।

সত্যকার গুরু হইবার অধিকার যাঁহার আছে, তিনি সে অধিকার লইয়া আসেন আর এক জগৎ হইতে। সকল মানুষই হইতেছে প্রাণী অথবা সকল মানুষই ব্রহ্ম, স্তবরাং মানুষে মানুষে ভেদ নাই, এই যে দুই দিকের দুই অতিমাত্রা, তাহা সত্য হইলেও শুধু এক হিসাবে সত্য, তাহা ঋণ ও নিষ্ক্রিয় সত্য। কিন্তু সত্যের সচল সক্রিয় রূপ যেখানে অর্থাৎ যে সত্য ধরিয়া স্রষ্টা চলিয়াছে, জীবনের গড়া পেটা হইতেছে সেখানে মানুষ মাঝে একই জীব বলিলে কিছুই বলা হইল না, সেখানে দেখি মানুষেরই মধ্যে আছে পশু, পিশাচ, রাক্ষস, অসুর এবং দেবতা—মানুষের মধ্যেই আবার রূপ লইতে পারেন স্বয়ং ভগবান। মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তাহা কেবলই সুযোগ সুবিধা ঘটনাচক্র বা দৈবাৎজনিত

নয়। স্বযোগ সুবিধা হইলে, শিক্ষা দীক্ষা পাইলেই যে কেহ, এমন কি আর কেহ যে নেপোলিয়ান বা বুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে এমন কোন সম্ভাবনা নাই। সৃষ্টিতে আছে একটা স্তর-বিন্যাস, একটা ক্রমপর্যায় ; সৃষ্টির পর্দা ঝাঁহারাই একটু তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ জিনিষটির অনিবার্য্য অব্যভিচারী অস্তিত্ব দেখিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম মানুষ মাত্রই সত্যের ভাণ্ডারী নয় ; সত্যের ঝাঁহারা ভাণ্ডারী—গোপাং ঋতস্যা, সত্যের ঝাঁহারা রক্ষণ পোষণ করেন—তাঁহারা আলাদা শ্রেণীর লোক। সত্যের জন্য তাঁহাদেরই কাছে যাইতে হয়, পূর্ণ প্রপত্তি লইয়া ; সত্যকে লাভ করিতে হয় কেবল জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসা দিয়া নয় কিন্তু আবার প্রণিপাতের দ্বারা, সেবার দ্বারা—তৎবুদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নে সেবয়া। যে সাধকেরা আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারাও ‘সমিধ-পাণি’ হইয়া আত্মবানের নিকট হইতেই আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন।

গুরু যে আত্মত্যাগের দাবি করে তাহা মানুষ হিসাবে ব্যক্তি হিসাবে আদৌ নয়—সত্যেরই দাবি হইতেছে গুরুর দাবি। আর যে মহাপুরুষ যত উপরের সত্যের বিগ্রহ, তাঁহার দাবির মাত্রাও তত কঠিন, সর্ব-গ্রাসী, নিরঙ্কুশ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্য দানবের কবলে কবলিত ; বিনা সাহায্যে বিনা আশ্রয়ে একলা চলিতে যে চাহে তাহাকে বিপথ-গামী করিতে, নষ্ট করিতে দানবদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। প্রত্যেক সাধকের অন্তরেই ত দনুর সম্ভানেরা বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে—সাধক যখন বলে বাহিরের কাহারও নির্দেশ আমি শুনিব না, আমি শুনিব আমার অন্তরের দেবতার বাণী, তখন দেবতার বাণীর পরিবর্তে দানবের বাণীই যদি সে শুনিয়া চলে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। বাহিরের গুরুকে প্রণিপাত না করিয়া অন্তরের গুরুকেই শুধু যে প্রণিপাত করিতে চায়, প্রায়শঃ সে তাহার সুবিধামত মন-গড়া গুরুকেই অভিবাদন করে।

দেবজন্ম

গুরু গুরু, কারণ তিনি সত্যসিদ্ধ, তিনি সত্যকে দানবের কবল হইতে পণিদের দুর্গম অন্ধকার গিরিগহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—এই কাজ তিনিও হয়ত তাঁহার গুরুর সহায়ে করিয়াছেন, আমাদেরও সেই রকম তাঁহারই সহায়ে করিতে হইবে। গুরুশক্তি হইতেছে নুত্তমান অগ্নি—দানবকে ভস্মীভূত করিয়া সত্যকে উদ্ধার করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে—আমাদিগকেও মূর্ত অগ্নি হইতে হইবে অর্থাৎ গুরুশক্তির সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হইবে।

গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ অতি নিবিড়, অতি রহস্যময়—দাম্পত্য সম্বন্ধেও সেই নিবিড়তা ও রহস্য আছে কি না সন্দেহ। গুরুর কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ফলে শিষ্যের নিজস্ব স্বাভাব্য, স্বধর্ম, ব্যক্তিত্ব, ব্যাষ্টিত্ব কিছু যে নষ্ট বা খর্ব্ব হইবে, এমন কোন আশঙ্কা নাই। মানুষের ব্যক্তিত্ব হারাঁইবার সম্ভাবনা হয় দুইটি কারণে। প্রথম, অহঙ্কার যখন অহঙ্কারের কাছে আত্মবলি দিতে বাধ্য হয়, অস্তুরকে যখন আর এক অস্তুরের গ্রাসের মধ্যে পড়িতে হয়। অথবা যদি দেবতার সত্যকার মহাপুরুষের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াই আমার ক্ষুদ্র সত্য, ক্ষুদ্র অহমিকা লইয়া, উপর হইতে গুরুশক্তির যে প্লাবন নামিয়া আসিতেছে তাহা হইতে নিজের সক্ষীর্ণ ব্যক্তিত্ব সামলাইবার জন্য নিজের চারিদিকে নাস্তির অস্বীকারের একটা কঠিন দেউল তুলিয়া ধরি। কিন্তু দেবত্বের কাছে মানুষ যত সম্পূর্ণ করিয়া আত্মবলি দিতে পারিবে, ততই সে তাহার নিজস্ব দেবতাকে, তাহার স্বকীয় ভাগবত বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করিয়া ধরিতে পারে।*

* চীন ঋষি লাওটসে বলিতেছেন :—

“True self-development is only attainable through selfless development. . . the more earnestly one may seek to develop oneself towards wisdom (Tao) the more one may be putting the obstruction of one's search in the way of the flow of the Tao through

তবে একথা হয়ত অস্বীকার করা যায় না যে সত্যকার গুরু মহাপুরুষ অতি দুর্লভ বস্তু। কিন্তু ভেদান বলিয়া খাঁটি জিনিষকেও অগ্রাহ্য করিতে হইবে, বিকৃতের সাথে সাথে প্রকৃতকেও বিসর্জন দিব—এ কোন ন্যায়? অন্ধকার আছে বলিয়া আলোকেও বিশ্বাস করিব না? সদ্‌গুরুর স্পর্শ বা সাক্ষাৎ যদি কাহারও না ঘটিয়াই থাকে, তবে তাহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে—অথবা হয়ত জগতে যে যাহার উপযুক্ত সে ঠিক সেই জিনিষই পাইয়া থাকে। কারণ, স্পষ্টই দেখিতেছি গুরুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যাঁহারা স্বাধীন সত্তা ফলাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ত আদৌ নিজস্ব কিছু অনুসরণ করিতেছেন না; দেশের গুরুকে আসন হইতে টানিয়া ফেলিয়াছেন বটে, কিন্তু সেখানে বসাইয়াছেন বিদেশের গুরু। ভাইয়া সকলওমালা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়া গাঁবীজীর কাছে মাথা নত করেন নাই, কিন্তু দেখিতেছি তিনি কার্যননো-বাক্যে আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছেন মার্কস ও লেনিনের কাছে।

one's nature. "What is this talk of developing oneself"? asks the man of Tao. "Rather," says he, "let Tao develop you as it is perpetually seeking to do...Your body is not your own. Your body is the delegated image of God. Your life is not your own. It is the delegated harmony of God. Your individuality is not your own. It is the delegated snake-skin of god." Lao-Tse's Tao-Teh-King.

দেবজাতির কথা

নূতন জগতের নূতন মানবজাতির কথা আমরা বলিতেছি। মানুষ সিদ্ধ-পুরুষ হইবে দেবতা হইবে, মানুষের সমাজ দেব-সমাজ হইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই, তাহার প্রণালী কি, উপায় কি—কঃ পদ্ম ? দুই-একজন মানুষ সাধনা করিয়া মুক্ত সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত সমাজের পরিবর্তন হইবে কি রকমে ? সাধারণ মানুষের শক্তিও নাই অবসরও নাই যে বড় বড় আদর্শ লইয়া চিন্তা করিতে পারে, সেজন্য তপস্যা করিতে পারে। সাধারণ মানুষ যে কেবল বাহ্যিক জালজঙ্ঘালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহা নয় ; ভিতরেও কত প্রাচীন সংস্কারের কত সনাতন প্রাকৃত-প্রেরণার বশীভূত সে। সাধারণ মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হইবে কিরূপে ? এক হইতে পারে যদি কোন অবতার বা অবতারকল্প পুরুষ (Superman) আসেন, আর তাঁর স্পর্শে যদি মানুষ সব বদলাইতে থাকে। সাধারণ মানুষের যোগী হইবার সুবিধাও নাই, ইচ্ছাও নাই—তাহাদের মুক্তির একমাত্র উপায় ভগবৎ প্রসাদ।

এ রকম যে না হইতে পারে, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। যে সব অবতারকল্প মহাপুরুষ পৃথিবীতে আসিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কথাই ধরা যাউক না। বুদ্ধদেব কি রকমে মানবজাতির একটা বেশ বৃহৎ অংশকে পরিবর্তিত করিয়া ফেলিলেন, তাহাদের মনের একটা বিশেষ গঠন দিয়া গেলেন, জীবনের একটা ছাঁচ গড়িয়া দিলেন। চৈতন্যও তাহার ভাবে একটা মানব গোষ্ঠীই তৈয়ার করিয়া লইলেন। মহান্দের এদিক দিয়া কি রকম শক্তি ছিল, সাধারণ মানুষের মন প্রাণকেই এমন কি দেহটিকে পর্য্যন্ত একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালাই করিয়া ফেলিবার

কি প্রতিভা বা তপোবল ছিল, তাহা এই সুদূর বঙ্গদেশের এক নিভৃত পল্লীর ক্ষেতে একটি মুসলমান চাষীকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিব। অবতারদের মহাপুরুষদের এরকম শক্তি থাকা অসম্ভব তাহা বলা চলে না। শুধু ভবিষ্যতে যে অবতার বা মহাপুরুষ আসিবেন তাঁহার হওয়া দরকার সকলের চেয়ে বড় অবতার, সকলের চেয়ে শক্তিশালী মহাপুরুষ; কারণ, তাঁহার কর্তৃক বিশেষ সম্ভব তৈয়ার করা নয়, কিন্তু সমস্ত মানবজাতিকে এক মহাবর্ষে মহাসম্মেলন বাঁধিয়া দেওয়া। তাই যদি হয়, তবেই সমস্ত মানবজ্ঞাতির পরিব্রাণ সম্ভব।

কিন্তু একটা কথা এখানে। যত মহাপুরুষ সব আসিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা মানুষের পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন কি ও কতখানি? বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ বা চৈতন্য করজ্ঞান মানুষকে মুক্ত অথবা সিদ্ধ করাইয়াছেন তার ইতিহাস আমাদের জানা নাই; কিন্তু এটা আমাদের সকলেরই জানা আছে যে বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মুসলমান বা বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া যে মানুষের গোষ্ঠী বর্তমান তাহারা মুক্তও নয়, সিদ্ধও নয়, প্রাকৃত মানুষ হইতে তাহাদের পার্থক্য যে খুব বেশী তা মনে হয় না। মহাপুরুষ লোকের মনের উপর প্রাণের উপর, এমন কি দেহের উপরও, তাঁহার একটা বিশেষ ছাপ রাখিয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তার মূল্য যে কিছু আছে তা ত দেখি না। বরং এই মনে হয় মহাপুরুষ যতখানি লোককে তাঁর কাজে লাগান বা না লাগান, লোকে তার বেশী মহাপুরুষকে তাদের কাজে লাগায়; মহাপুরুষ যতখানি লোককে উঠাইয়া ধরেন বা না ধরেন, লোকে তার বেশী মহাপুরুষকে নানাইয়া ফেলে। যে দিব্য উপলব্ধি মহাপুরুষ লোকের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন, লোকে সেটিকে আপন সহজ প্রাকৃত স্বভাবের মধ্যে বিকৃত করিয়া ফেলিয়া নিশাইয়া ধরে; দিব্য সত্য প্রাকৃত স্বভাবকে আপনার মধ্যে পরিবর্তিত রূপান্তরিত করিয়া লয় না, প্রাকৃত স্বভাবই দিব্য সত্যকে

দেবজন্ম

আপনার স্তরে টানিয়া লইয়া আপনার মত করিয়া নয়। মহাপুরুষেরা কার্য্যতঃ প্রাকৃতলোকের প্রাকৃতস্বভাবের তৃপ্তির জন্য নূতন নূতন বিষয় বা পথ আবিষ্কার করিয়া দেন মাত্র। মহাপুরুষের জীবিতকালে, গোড়ায় যে ধর্ম্ম যত বিশুদ্ধ যত উন্নত যত শক্তিশালী থাকুক না কেন, মহাপুরুষের তিরোভাবে, উত্তরকালে, সব ধর্ম্মেই দেখি এই এক পরিণতি।

প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের ভিতরের প্রেরণার স্বেচ্ছায় পরিবর্তিত না হয়, তবে মহাপুরুষ আসিয়া কি করিবেন? পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন হইয়াছে, চিরদিন তাহাই হইবে। দুই একজন তরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সমাজের উপায় কি? দিব্য মানুষের সমাজ গড়িতে হইবে, কিন্তু সেজন্য দরকার প্রত্যেক মানুষের দেবতা হওয়া। মানুষের ভিতরে যদি একটা জাগ্রত দেবতা থাকে, সে দেবতা যদি সজ্ঞানে চায় আপনার প্রতিষ্ঠা, তবে মহাপুরুষ অর্ধাৎ স্বর্গের দেবতা আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু ভুলাইয়া, মাতাইয়া ত মানুষকে স্থায়ীভাবে দেবতা করা সম্ভব নয়। সে ত আবু হোসেনের এক রাত্তিরের বাদশা-গিরি। সুতরাং মহাপুরুষের উপর সব নির্ভর করা চলে না; নির্ভর যদি করিতে হয় তবে বিশেষভাবে করিতে হইবে মানুষের স্বভাবের উপর, সমাজের নৈসর্গিক গতির উপর, প্রকৃতির ক্রমপরিণতির টানের উপর।

নূতন মানব, দেব-সমাজ আসিবে কি রকমে তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি যদি পৃথিবীতে নূতন নূতন জীবশ্রেণী আসিয়াছে কি রকমে তার ইতিহাসটা দেখিয়া লই। প্রাণী-জগতে আছে নানা শ্রেণীর স্তর; নীচের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া সে-গুলিকে মোটামুটি এই রকমে সাজাইতে পারি—স্পঞ্জ, কৃমি, পোকামাকড়, শামুক আর সকলের উপরে মেরুদণ্ডযুক্ত জীব; এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে আছে প্রথমে ডিম্বজাত জীব—যেমন মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, আর তারপর আছে স্তন্যপায়ী

—যেমন সিংহ, ব্যাঘ্রবৎ ইতর জন্তু, বানর ও মানুষ। *পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-গণ বলিতেছেন এই যে নানা শ্রেণীর নানা জাতির প্রাণী ইহারা সকলেই পৃথিবীতে চিরকাল ছিল না—যে রকমে ইহাদের স্তরবিভাগ করা হইয়াছে সেই রকমে ক্রমে ক্রমে ইহারা আবির্ভূত হইয়াছে। নূলে কিন্তু ইহারা একদিন একই ধরণের জীব ছিল, এই নোলিক জীবজাতির ক্রম-পরিণতি ফলেই স্তরের পর স্তর ফুটিয়া উঠিয়াছে—জীবজগতে এত বৈচিত্র্য ও উন্নতি দেখা দিয়াছে। এখন একটি কথা এইখানে—এক শ্রেণীর জীব আর-এক শ্রেণীতে পরিণত উন্নত হয় কি রকমে? প্রথমে বিশ্বাস ছিল (Darwin যেমন বলিতেন) যে অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে বদলাইয়া এক শ্রেণী আর-এক শ্রেণীর জন্ম দিয়াছে। একটা শ্রেণীর একটি বা কয়েকটি জীবের মধ্যে প্রথমে একটা ক্ষুদ্র পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, সেইটি যখন একটা বিশেষ আবহাওয়ার, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জীবনধারণের নিত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে বা ইহাৰ উপক্ৰম করিয়াছে তখন সেই জীবাট বা জীবক'টির সম্ভান সম্ভতিতে সেই পরিবর্তন সুস্পষ্ট হইয়া চলিয়াছে এবং পরে ইহারা সকলে মিলিয়া একটা বিশিষ্ট নুতন শ্রেণীই গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সমস্যা এই যে এরকম ক্ষুদ্র পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হইয়া উঠে কি না? গোড়ার ছোট ছোট পরিবর্তন (variation) একত্র হইয়া ওরকম বৃহৎ একটা ধারার সৃষ্টি করিতে পারে কি না? তারপর এক এক শ্রেণীর জীব ধীরে ধীরে বদলাইয়া যদি আর-এক শ্রেণীতে পরিণত হয়, তবে মনের এই আশ্বে আশ্বে বদলানোর কালের জীবশ্রেণী কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? এই missing link-এর চিহ্ন পাইবার জন্য কত জ্ঞানগায় চোঁড়া খোঁড়া হইতেছে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। তাই আজকাল আর একটা বিশ্বাস হইতেছে (De Vries যেমন বলিতেছেন যে এক জীবশ্রেণী আর এক জীবশ্রেণীতে পরিণত

দেবজন্ম

হয় ছোট ছোট পরিবর্তনের সমাহার ফলে, বিবর্তনের স্তর আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া ওঠে না, কিন্তু এ কাণ্ডটা হয় হঠাৎ, sudden mutation দ্বারা,) প্রকৃতি চিরদিন গড়াইতে গড়াইতে চলেন না, তিনি মাঝে বাষ্প প্রদান করিতে জানেন, per saltum। ভিতরে ভিতরে আস্তে আস্তে একটা কি ধীরে ধীরে তৈয়ার হইলেও হইতে পারে কিন্তু তার ইতিহাস আমরা জানি না, আমরা যখন চোখ মেলিয়া চাই তখন দেখি একটা স্তর কোন সময়ে আর-একটা স্তরে উঠিয়া পড়িয়াছে।

মানুষের পরে যে একটা নূতন জীবের কথা আমরা বলিতেছি, তাহা আসিবে কি না জড়বিজ্ঞান সে-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে না। মানুষ পর্যন্ত আসিয়াই যে বিবর্তনের দ্বারা গামিয়া বাইবে তাহাও জড়বিজ্ঞান বলিতেছে না। তবে মানুষের মধ্যে বাছাই করিয়া মানুষকেই নাজিয়া ঘষিয়া এক রকম নূতন মানবজাতি গড়ার চেষ্টা জড়বিজ্ঞানে দেখা যাইতেছে—এইজন্যই নূতন একটা বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে, নাম তার Eugenics, বাংলায় মাঝে মাঝে তাকে বলা হয় সুষ্প্রজনন বিদ্যা। কিন্তু এ বিদ্যার দোড় কতখানি তাহার আলোচনা আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। আমরা বিচার করিতেছিলাম মানুষের পরে একটা নূতন জীবশ্রেণী—তাহাকে অতিমানুষ অথবা দেবতা অথবা সিদ্ধ যে নামই দেই না কেন—যদি আবির্ভূত হয়, তবে তাহা হইবে কিরূপে?

মানুষ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া দেবজাতির জন্ম দিতে পারে। কিন্তু আর এক সম্ভাবনাও আমরা দেখিয়াছি। বানর আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হইয়া যে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আধুনিকের মীমাংসা যেটি অর্থাৎ একটা হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে বানরজাতি হইতে মানুষ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এইটাই বেশী সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। মানুষের স্বভাবকে আস্তে আস্তে পরিবর্তন করিতে হইবে, একটি

একটি করিয়া তাহার গলদ বাহির করিতে হইবে, প্রত্যেক ব্যক্তি ঘোর তপস্যা করিতে থাকিবে, তিলে তিলে পঞ্চাগ্নির মধ্যে আপনাকে পরি-
শুদ্ধ করিয়া তুলিবে—এই রকম পথের দ্বারা যখন ছকিয়া নই তখনই
সকল আশা জলাঞ্জলি দিতে হয়। কিন্তু পথটা যে এইরকমই হইবে
জড়বিজ্ঞানও তাহা বলিতেছে না।

পথ কতকটা এই রকমও কল্পনা করা যাইতে পারে। মানুষের
ভিতরে একটা বিবর্তনের তোড় চলিয়াছে—কোথাও সেটা স্ফুট জাগ্রত,
কোথাও গুপ্ত অজ্ঞাত। মানুষের মধ্যে সাধক যাহারা মহাপুরুষ যাহারা
তঁাহাদেরই মধ্যে প্রকৃতির কল-কারখানার চেহারাটি ফুটিয়া গোচর হইয়া
দেখা দিয়াছে, তঁাহাদেরই মধ্যে ধরা পড়িয়াছে প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রণালী,
তাহার নিবিড় রহস্য। অন্যত্র কবির মধ্যে, দার্শনিকের মধ্যে,
ভাবুকের মধ্যে, চিন্তাশীলের মধ্যেও উহাই আধ আধ দেখা দিয়াছে।
সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে সেই কাজই চলিয়াছে কিন্তু
গোপনে, তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহাদের মগ্ন চেতনায়।
এখন এই ভিতরের গড়া যখন এমন পাকা হইয়া উঠিবে যে তাহাকে
আর রাখা যায় না, ধরিত্রীর দশনাস যখন পূর্ণ হইবে তখন হঠাৎ একদিন
খোলস ভাঙ্গিয়া পড়িবে, দেখিব কি অপূর্ব প্রজাপতি কোষমুক্ত হইয়া
আপন অখণ্ড শ্রীতে বিরাজমান।

অবশ্য এমন কথা বলা চলে না যে মানুষ নাট্রেই সেই দেবজ্ঞাতিতে
পরিণত হইবে। দেবজ্ঞাতির অন্তরাত্মা যে-মানুষের মধ্যে ফুটিয়া
উঠিবার বসবাস করিবার স্থান পাইয়াছে সেই সেই মানুষই দেবতা হইবে।
অন্ততঃ দেবতার জনক হইবে; সে দেব-অন্তরাত্মা যেখানে বিকল
হইয়া ফিরিয়াছে তাহা মানুষই থাকিয়া যাইবে বা ধরা পৃষ্ঠ হইতে লোপ
পাইবে। জীববিদ্যা তা স্পষ্টই বলিতেছে যে প্রতি বৎসর না হউক
প্রতি দশবৎসর অন্তর অন্তর একটা না একটা জীবশ্রেণী লোপ

দেবজন্ম

পাইতেছে। ইহা দুঃখের কথা হইতে পারে, কিন্তু এই রকম হইতেছে ও হইবে। স্তন্যপায়ী জন্তুরা (mammalia) তাদের পূর্বগামী বিপুলকায় সরীসৃপ (reptilia) দিগকে কোনঠেসা করিয়া রাখিয়াছে অথবা তাড়াইয়া দিয়াছে (ইহাদের স্বংসাবশেষ এখনও আমাদিগকে চমৎকৃত স্তম্ভিত করিয়া দেয়), সেই রকম মানুষও আসিয়া ক্রমে স্তন্যপায়ী জন্তুকে অণ্ডজ পক্ষীকেও স্বংস করিতে করিতে চলিয়াছে, নিজের কাছে লাগে শুধু সেইগুলিকেই বাঁচাইতেছে। আবার মানুষের পরে আসিবে যাহারা তাহাদের আগমনের ফলে মানুষ থাকিয়া যাইবে যাহারা তাহারা যদি ছারায় পড়িয়া যার বা ক্রমে ক্রমে লোপ পায় তাহাও আশ্চর্যের কিছুই নয়।

কিন্তু এসব পরের কথা। আগে আমাদিগকে নব জীবশ্রেণীর সৃষ্টির কথা ভাবিতে হইবে, ভিতরে ভিতরে গড়িয়া ওঠা ব্যাপারটির উপর দৃষ্টি দিতে হইবে। কারণ, এ কথা সত্য, এ যাবৎ জীববিভাগে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা হইয়াছে অজ্ঞানতঃ—চতুষ্পদ জন্তু কি রকমে বানরের জন্ম দিল তাহা চতুষ্পদ জন্তু জানে না, বানর কোন প্রণালীতে মানুষের জন্ম স্থান করিয়া দিল তাহার গুপ্তত্ব বানরের চেতনায় নাই; প্রকৃতির কোথাও একটা সে চেতনা থাকিতে পারে, কিন্তু পরিস্ফুট হইয়া তাহা রূখনও দেখা দেয় নাই, সব কাজটাই হইয়াছে যেন একটা গোপন অন্তরে যবনিকার আড়ালে, জাগ্রত চেতনার বাহিরে। এটা অতীত ইতিহাসের কথা। কিন্তু ভবিষ্যতের ইতিহাসও যে তাই বলিয়া এ রকমই হইবে তাহা বলা যায় না। কারণ, যে মুহূর্তে মানুষ আসিয়াছে সেই মুহূর্তেই অন্তর পদার্থটা স্বচ্ছ হইয়া দেখা দিয়াছে, যেটা ছিল গোপন মগ্নচেতন অন্তঃসংক্র সেইটাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে ব্যক্ত সজাগ বহিঃপ্রজ্ঞ; আর সেই উন্মোচনের আশ্রয়বোধের সাথে ফুটিয়া উঠিয়াছে সজ্ঞান চেষ্টা। ইতর জীবজগতে যে বিবর্তন হইয়াছে সেটা হইয়া গিয়াছে যেন অন্ধ

প্রকৃতির চাপে আয়ত্ব হারা ভাবে—কিন্তু মানুষে উঠিয়া সেই প্রকৃতি চোখ নেলিয়া চাহিয়াছে, সেই মানুষের পরে যে বিবর্তন ঘটবে সেটার মধ্যে একটা সজ্ঞান চেষ্টার বা শক্তিপ্রয়োগের ভাগ থাকিবে, তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

মানুষের মধ্যে যুগে যুগে দেবজাতির একটা স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, মানুষ সজ্ঞানে চেষ্টা করিয়াছে পৃথিবীর স্থূল প্রতিষ্ঠানে তাহার একটা রূপ দিতে। জগতের যাবতীয় ধর্মসম্বন্ধে এই চেষ্টারই একটা নিদর্শন পাই। এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা যে সফল হয় নাই তার অর্থ এমন নয় যে তাহা সফল হইবার জিনিষ নয়। মানুষ পর্য্যন্ত উঠিতে, মানুষের রূপ দিতে প্রকৃতি ত কত ছাঁচ বানাইয়া আবার ভাঙিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, অথবা এক পাশে ঝাঁট দিয়া পুঞ্জ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই রকম মানুষের মধ্যেও আর-একটা জীবকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রকৃতির যে সজ্ঞান চেষ্টা চলিয়াছে তাহার প্রত্যাখ্যাত ভগ্ন নিদর্শন সব রহিয়াছে প্রাচীন ধর্মসম্বন্ধ সমূহের মধ্যে। সে সব চেষ্টা যে একেবারে বিফল হইয়াছে তাহা নয়—প্রত্যেক চেষ্টা এক একটা নূতন উপাদান আনিয়া দিয়াছে, মানুষের মধ্যে সেই দেব-আত্মাকে ধীরে ধীরে পুরট করিয়া আনিয়াছে। এখন বর্তমান যুগে আবার যে একটা নূতন চেষ্টার ঢেউ দেখিতেছি, তাহা এই রকম একটা মধ্যপথের আংশিক চেষ্টা, না পূর্ণ সফলতার জোয়ার, তাহা দেখিতে হইবে আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি দিয়া, পরিচয় লইতে হইবে কর্ম দেখিয়া ফল দেখিয়া।

মানুষের মূল কর্মচেষ্টা, তাহার অন্তরায়ার ধর্ম এই রকমই একটা মহাব্রতে নিযুক্ত হইতেছে ও হইতে চাহে—এই নিয়োগ কোথাও খুবই স্পষ্ট আশ্রয়প্রতিষ্ঠ, কোথাও তাহা কিছু আবৃত, সন্দেহদোলায় দুল্যমান। এই ব্রতের অগ্রণী ষাঁহারা তাঁহাদেরই মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে ফুটিবে নব জাতির নূতন রূপ। ইহার মুখ গোড়ায় একটা হইবে, কি বহু

দেবজন্ম

হইবে, এক অবতারকে অগ্রে লইয়া ইহা বিকশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে, কি বহু মহাপুরুষের চারিদিকে গণ্ডী লইয়া বহু খাত কাটিতে থাকিবে, পরে গণ্ডী সব ভাঙ্গিয়া গিয়া একই মহাসাগর স্রষ্ট করিবে— ঠিক কি ভাবে হইবে সেটি কিন্তু আসল কথা নয়।

আসল কথা ভিতরের আত্মনাটকের প্রেরণাটিকে ধরা স্পষ্ট করিয়া চেনা। এই আত্মনাকে প্রেরণাকে যাহারা স্বীকার করে, পাইতে চায় তাহারাই নবযুগের সাধক, নবযুগের যোগী, দেবজাতির প্রতিষ্ঠাতা। অন্য ধর্মে অলপে বাঁহাদের তৃপ্তি নাই, তাঁহারা নিজের ভিতরে দেব-আত্মাকে জাগাইবেন, নিজের ভিতরেই দেবজাতিকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। বাঁহারা ব্যক্তিভাবে চাহেন তাঁহারা সেইভাবেই চলিবেন, বাঁহারা সম্বৎ বা চক্র বাঁধিয়া এ সাধনা করিতে চাহেন তাঁহারা তাহাই করিবেন। এই ভিতরটা একবার ঠিক হইলে, ঠিক পথে চলিলে এবং তাহারই সত্যে ও ধাতে কৰ্ম্ম করিয়া চলিলে বাহিরের আকারে প্রতিষ্ঠানে সামঞ্জস্য, সঙ্গতি, পূর্ণতা, ঋদ্ধতা আপনা হইতেই আসিবে।

মানুষের ভগবান

মানুষের মধ্যে আছে একটা অসীম অনন্ত। মানুষের মানুষত্বকে এই অসীম অনন্তের গুণক (power) দিয়া বাড়াইয়া চড়াইয়া নইলে যে বস্তুটি হয় ইহাই ভগবান। মানুষত্ব কাহাকে বলি? দেহ প্রাণ হৃদয় ও মস্তিষ্ক—এই চারিটি জিনিষের সত্য নইয়া অর্থাৎ সত্তা, শক্তি, প্রেম ও জ্ঞান নইয়া মানুষের মানুষত্ব। ভগবান হইতেছেন এই কয়টির অনন্ত গুণক—অর্থাৎ অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম।

এখন প্রথমেই এখানে একটি কথা উঠে। ভগবান শুধু মানুষদেরই ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবেন কেন? কেবল মানুষ নয়, বিশ্বজগৎসত্তার যে অনন্ত-প্রকরণ, ভগবান নাম দিতে হয় তাহাকেই দিতে হইবে। অনন্তের ভগবানই ভগবান, খণ্ডের অংশের ভগবানকে ভগবান বলা যায় না। প্রকৃত ভগবান মানুষেরও যেমন ভগবান, জীবজন্তুরও তেমনি ভগবান, আবার তরুলতা, জড়পদার্থেরও ভগবান। সুতরাং শুধু মানুষধর্মকে ভগবানের উপর আরোপ করিলে ভগবানকে ছোট করা হয়, ভগবান আর ভগবান থাকেন না; বিশ্বসত্তার একটা সর্ব-সাধারণ ধর্ম ছাড়া কোন ক্ষুদ্র বিশেষ আংশিক ধর্ম ভগবানের থাকিতে পারে না।

ঠিক কথা, সসীম মানুষের ঋণশ্রী ভগবানের ষাড়ে চাপাইয়া দিয়াই অনেক গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মানুষকে যখন অনন্তের মধ্যে নইয়া যাই, তখন তাহার ধর্ম আর একান্ত মানুষধর্মই থাকে না, অনন্তত্বের জন্য তাহা হইয়া পড়ে বিশ্বেরই নিগূঢ় ধর্ম। সাধারণতঃ মানুষের অনন্তত্ব কল্পনা করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা অনন্ত পর্য্যন্ত

দেবজন্ম

পৌঁছিতে পারি না, শুধু খুব অনেকখানি বাড়াইয়া লই মাত্র। ভগবান একটা বিপুলকায় মানুষ, এই ধারণাই আমাদের স্বভাবতঃ হয়—তাহার শরীরে অসাধারণ জোর, তীক্ষ্ণ জ্ঞানের সহায়ে তিনি সবই জানেন শুনেন, আর উদার হৃদয় দিয়া তিনি খুব ভালবাসিতে পারেন। ভগবানকে এই ভাবে ধারণা করিয়া লই বলিয়াই নানা সমস্যা পদে পদে আমাদের লাক্ষিত করিয়া তোলে, বাস্তবে ঘটিতেছে বাহ্য তাহাকে আমাদের এই কাল্পনিক ভগবানের সহিত সমঞ্জস করিয়া ধরিতে কত দার্শনিকের গলদঘর্ষণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু গোড়াতেই যে মস্ত ভুল রহিয়া গিয়াছে সেদিকে তেমন খেয়াল কাহারও নাই। ভগবান হইতেছেন মানুষের অনন্তত্ব; কিন্তু অনন্তকে ধারণা করিতে গিয়া আমরা শুধু ধরিয়া লই বৃহৎ। কিন্তু বৃহতে 'ও' অনন্তে অনেক পার্থক্য। কোন গুণ বা ধর্মকে যতই বৃহৎ করিয়া লই না কেন তাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন বাহ্য কিছু হয় সোটি নেহাৎ বাহিরের আকারের। কিন্তু কোন গুণ বা ধর্মকে যদি অনন্ত করিয়া তুলি তবে তাহাতে হয় একটা গভীরতর পরিবর্তন। অর্থাৎ সেই গুণের বা ধর্মের সহজ পরিচিত প্রকাশ যোটি তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়—তাহার ভিতরের আসল গভাটি হয়ত পরিবর্তন হয় না, বরং সেইটিই শুধু এখন সম্যক ফুটিয়া উঠে—কিন্তু তাহাতে এমন একটি রং ধরে যাহা সম্পূর্ণ নূতন। সুতরাং যখন বলি মানুষের সত্তা জ্ঞান শক্তি প্রেমের অনন্ত ভাবই হইতেছে ভগবান, তখন সেই সত্তা শক্তি জ্ঞান প্রেমের স্বভাব ও স্বরূপ ঠিক আমাদের পরিচিত জিনিষগুলি আর থাকে না, তাহা হইয়া পড়ে আর এক ধরণের—এমন জিনিষ মানুষের মধ্যে যাহার একটা খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে ঐ নামে। ভাগবত সত্তা, ভাগবত জ্ঞান, ভাগবত শক্তি, ভাগবত প্রেমের অন্য নাম সৎ-চিৎ-তপঃ-আনন্দ। এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝি না বলিয়া ভগবানকে আমরা অতিমাত্র মানুষভাবাপন্ন (anthropomor-

phic) করিয়া ফেলি—জগতের অবস্থা দেখিয়া ঠিক করিতে পারি না ভগবানের দয়া আছে বা নাই, দয়া থাকিলে হয়ত বা তাঁহার সেই অনুপাতে শক্তি নাই অথবা তিনি এসব কিছুই নহেন—তিনি হইতেছেন যন্ত্রের নিয়ম (mechanical law) কিম্বা নিগুণ অক্ষর ব্রহ্ম, শুধু একং সৎ ।

আর এই কথাটি বুঝিলে আমরা বুঝিব মানুষের ভগবান শুধু মানুষেরই নয় বিশ্বের । মানুষকে বড় করিয়া নইলে বিশ্বেই পৌঁছি না বটে কিন্তু মানুষকে অনন্ত করিয়া নইলে বিশ্বেই পৌঁছি । মানুষকে ভগবানের মানদণ্ড যে করি তাহার দুইটি কারণ । প্রথমতঃ, আমরা মানুষ ; অনন্তের সাথে ভগবানের সাথে আমাদের পরিচয় ও সম্বন্ধ মানুষ-ভাবেই মধ্য দিয়া । ইহাতে ভগবানের স্বরূপ নির্ণয়ে কিছু ব্যাঘাত হয় না, কারণ অনন্ত যে ভগবান মানুষও তাহার অন্তর্ভুক্ত, মানুষকে বাদ দিয়া তাহা নাই । দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে মানুষের দান্তিকতা কিছু নাই, মানুষ বর্তমানে বিশ্বের চুড়া, সৃষ্টির মুখপাত্র । বিশ্বের সৃষ্টির যে গুণ যে ধর্ম মানুষের মধ্যেই তাহা পুরাপুরি প্রকাশ পাইয়াছে— মানুষ-ভাবেই রং তাহাতে ধরিয়াকে বটে কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া বিশ্ব-বস্তুটিরই গুণধর্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে । কেবল এইটুকু স্মরণ রাখিলেই হইল যে মানুষের বৃহত্ত্ব নয় মানুষের অনন্তত্বই হইতেছে বিশ্ব ও ভগবানত্ব । মানুষের স্বভাব স্বধর্মকে গুণধর্মকে কেবল নাজিয়া ঘষিয়া বাড়াইয়া নইলেই হইল না, তাহাকে রূপান্তরিত করিয়াই তুলিয়া ধরিতে হইবে । চর্চা অনুশীলন বা culture করিয়া নয় কিন্তু একটা নবজন্ম দিয়াই মানুষকে ভগবানে পরিবর্তিত করা সম্ভব ।

মানুষের আছে দেহ প্রাণ মন হৃদয়—অথাৎ বাঁচিবার, কাজ করিবার, জ্ঞানিবার, ভালবাসিবার প্রবৃত্তি বা ধর্ম ; ইহাদের রূপান্তর বা স্বরূপটি লইয়া হইতেছেন ভগবান অথাৎ ভগবান সৎ বা অস্তি, ভগবান তপঃ-

দেবজন্ম

শক্তি, ভগবান চিন্ময়, ভগবান আনন্দময়। কিন্তু মানুষের চারিটি স্তরকে চারিটি স্তরের বৃত্তিকে সংযুক্ত করিয়া একমুখা করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে আর একটি জিনিষ, তাহার নাম অহংকার। মানুষের দেহ প্রাণ মন হৃদয় যেমন সান্ত, সেই রকম এই সকলের গ্রন্থী বা কেন্দ্র যে অহংকার তাহাও একটি সান্ত বস্তু। দেহ প্রাণ মন হৃদয়—সত্তা শক্তি জ্ঞান ও কর্ণের অনন্তভাব লইয়া ভগবানের ধর্ম, সেইরকম অহংকারেরও যে অনন্তভাব তাহাই হইতেছে আবার ভগবানের ব্যক্তিত্ব (personality)। মানুষের অহমিকা খারাপ জিনিষ বলিয়া অনেক তিরস্কৃত হইয়াছে, নারী নোহ বলিয়াও ইহাকে উড়াইয়া দিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু অহমিকার বাহ্য চেহারাটি যতই দুষ্টবীর্য বর্জনীয় বা ভুল বলিয়া বোধ হউক না কেন, অহমিকার মধ্য দিয়াই বিদ্যুত বিক্ষিপ্ত একাকার যে বিশ্ববস্তু তাহা কেন্দ্রগত হইয়া “রূপে রূপে বহুরূপ হইয়া” কুটিয়া উঠিয়াছে, সজীব সচেতন আত্মবুদ্ধ ব্যক্তিকে ফলাইয়া ধরিয়াছে। অহমিকা ছায়ামাত্র, ইহার পিছনে প্রসারিত আছে একটা মহাগত্য—অহংয়ের পশ্চাতে জীব, জীবের পশ্চাতে জীবের যে অনন্তভাব যে ভাগবত রূপ তাহা শিব।

অহংএর অনন্তে রূপান্তর একটা আছে বলিয়াই ভগবান ভগবান অর্থাৎ শুধু বৈদান্তিকের সচ্চিদানন্দ বা নিগূঢ় অক্ষর ব্রহ্ম নহেন। সান্তে সঙ্গীনের মধ্যে যাহা অহং, অনন্তে অসীমে তাহাই ভগবানের সগুণ ব্যক্তিত্ব। অহংএর বা জীবের যে নিগূঢ় ধর্ম ভাগবত ব্যক্তিত্বেরও সেই একই ধর্ম। ভগবান ভগবান, কারণ তিনি দ্রষ্টা কর্তা ভোক্তা ও ভর্তা—ভগবানে ব্যক্তিত্ব একটা আছে, তাই তাঁহাতে সম্ভব হইয়াছে একটা সম্মানে দেখাশুনা, কাজ করা, আনন্দ উপভোগ করা, সব ধরিয়া ভরিয়া সাজাইয়া বাড়াইয়া তোলা। ভগবানে এই ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়াই তিনি নিয়ন্তা বিধাতা, তিনি পরম প্রেমাম্পদ, তিনি প্রভু তিনি গুরু,

তাই “পিতা নোথসি” বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে মানুষ কোন মারাত্মক ব্রনে বা উদ্ভট কবিকল্পনার জালে পতিত হয় না।

কিন্তু এইখানে একটি কথা উঠিতে পারে, মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব সম্ভব, কারণ মানুষ বহু আর বহু বা নানানই ব্যক্তিত্বের মূল ও প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তি অর্থই বহু ব্যক্তি—এক অহং এক জীব আর আর অহং আর আর জীবের সহিত মিলনের হউক হৃদয়ের হউক সম্বন্ধে সম্বন্ধ। কিন্তু যাহা এক অধিতীয় অনন্ত তাহাতে ব্যক্তিত্বের সম্ভব কেমন করিয়া হয়? অহংএর জীবের প্রতীক বা পরিণতি শিব নয়, অহংএর জীবের নাশ পরিনির্বাণই শিব। ভাগবত স্তরে অনন্ত এক ভগবান সকলকে সমস্তকে ঘিরিয়া গ্রাস করিয়া আছে, সেখানে দুইএর সম্ভাবনা নাই; যেখানে দুই নাই সেখানে ব্যক্তির কল্পনা কল্পনা মাত্র। ব্যক্তির বর্নন ক্রিয়া, আর ক্রিয়া হয় তখনই যখন কর্তা ও করণ ভিনু হইয়া দেখা দেয়। অনন্তকে ত ভিনু করা যায় না, অনন্তের মধ্যে ভাগ নাই অংশ নাই। কিন্তু তাই কি? আমরা বলি অনন্তও দুই রকম হইতে পারে, এক নির্গুণ শূন্য অনন্ত, আর সগুণ পূর্ণ অনন্ত। নির্গুণ শূন্য অনন্তে ভিনুতা নাই, তাহাতে ব্যক্তিত্বও নাই; কিন্তু সগুণ পূর্ণ অনন্তে ভিনুতাও আছে, তাই ব্যক্তিত্বও তাহাতে আছে। অনন্ত ভগবান আপনার মধ্যে একটা ভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনাকে আপনা হইতে বাহির করিয়া দিয়া নিজের এই দুইখণ্ডের সম্বন্ধে লেনা দেনার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভর্তৃত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আপনার এই ব্যক্তিত্বের বিভূতি দিয়াই সগুণ পূর্ণ অনন্ত বিশ্বচরাচরে বিভিন্ন নাম বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন বর্নন বিভিন্ন কর্ণ—বহুল ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অহংএর আদৌ উৎপত্তি হইল কি করিয়া? অনন্তে ভগবানে গোড়ার ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া—সেই তুরীয়ার বিশ্ব-ব্যক্তিত্ব খণ্ড হইয়া সঙ্গীর্ণ হইয়া ছোট

দেবজন্ম

হইয়া খাটি হইয়া যখন দেখা দিয়াছে তখনই তাহাকে বলি মানুষের ব্যক্তিগত অহংকার।

কিন্তু এখানেও এ কথা মনে রাখতে হইবে অহংকারের অসীম বিস্তৃতিই ভাগবত ব্যক্তিত্ব নহে—এখানেও চাই বৃদ্ধি নয় কিন্তু রূপান্তর। অহংকারকে যতই বাড়াইয়া বিপুল করিয়া অথবা উদার করিয়াই লই না কেন, তাহাতে বাহা পাই তাহার নাম অম্বর। বিপুল অহংকার আর তার সাথে বিপুল অধিষ্ঠান বিপুল জ্ঞান বিপুল শক্তি বিপুল ভোগ লইয়া ভগবানের কাছাকাছি কিছু হওয়া যায় না। সেই বিপুলতা যতক্ষণ অনন্তের মধ্যে বাইয়া নূতন ভাব একটা না ধারণ করিতে পারিতেছে ততক্ষণ তাহা একান্ত মানুষের, ঐহিকেরই জিনিষ। বৃহৎ হইতে বৃহত্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া যে অনন্তে ভগবানে পৌঁছান যায় না, তাহা নহে। কিন্তু সেটা একটা পথ মাত্র। ক্ষুদ্রের মধ্যে থাকিয়াও ভিতরের একটা শোধনে পরিবর্তনে (transmutation) অতি নিকটেই পাওয়া যায় আবার সেই অনন্তকে। অনন্ত শুধু মহতো মহীয়ানই নয়, সে যে আবার অপরোণীয়ান।

মানুষের বাহা আছে, ভগবানেরও তাহাই আছে কিন্তু অনন্তের মাপে ওজনে রঙে রূপে। মানুষ যে স্বভাবে যে স্বধর্মে যে গুণে যে কর্ণে স্বগুণ জীব, ভগবানও সেই স্বভাবে সেই স্বধর্মে সেই গুণে সেই কর্ণে—অনন্তের মাত্রায়—সগুণ শিব। ভুল হয় আমাদের এইখানে, অনন্ত অর্থে আমরা কল্পনা করি শুধু বৃহৎ—অনন্তে আছে যে রূপান্তর তাহা আমাদের বুদ্ধি বা সংস্কার ধরিতে পারে না। অনন্তের পরশমণি স্পর্শ করিয়া মানুষীভাব সব ঠিক কি রূপান্তর পায়, তাহা নির্দেশ করা কঠিন, তাহা উপলব্ধি করিবার, দেখিবার জিনিষ, মুখে বলিবার নয়।

অবিভ্রা মৃত্যুং তীৰ্ণা

খারাপ বলিয়া আলাদা কিছু জিনিষ নাই—ভালরই বিকৃতি, ব্যভিচার বা অপব্রংশ হইতেছে খারাপ। সুতরাং ভালকে চাহিলে যে খারাপের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কিছু করিতে হইবে, খারাপ যে দিকে চলিয়াছে ঠিক তাহার উলটা দিকেই চলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বরং অনেক সময়ে দেখি খারাপ চলিয়াছে ভালর একেবারে গা ঘেঁষিয়া ; এক জায়গায় সামান্য একটু বাঁকিয়া মুচড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই ভাল হইতে হইতে একটা জিনিষ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, একটা উপাদান কোথাও একটু বেশী হইয়াছে কি কম হইয়াছে, অনুপান সামান্য কড়া হইয়াছে কি মিঠা হইয়াছে, আর তাহারই ফলে অতি ভালকেও দেখা যাইতেছে অতি খারাপ। ভাল-খারাপ যমজ সন্তান, উভয়ের চেহারা একই ছাঁচের তবে একজন কাল আর একজন জ্যোতির্গয়, এই পার্থক্য। শয়তান যাহাকে বলি সে ত এককালে ছিল এঞ্জেল—এঞ্জেলদের মধ্যে সেরা এঞ্জেল, তাহার নাম Lucifer—জ্যোতি যে লইয়া আসে Son of the morning—উষার পুত্র।

বেদান্তে তাই বলে, মিথ্যা অর্থ এমন নয় বাহা একান্ত অ-সত্য, মিথ্যা অর্থ সত্যভাস, বাহা সত্য এবং অসত্য বুগপং—সত্য হইতেছে বাহা অস্তি, আর মিথ্যা হইতেছে অস্তি-নাস্তির অনির্বচনীয় সন্মিলন।

সত্যকে পাইতে হইলে তাই মিথ্যার পাশে পাশেই চলিতে হয়—মিথ্যাকে একান্ত অসত্য বলিয়া যে মিথ্যাকে সামনেই আনিবে না, তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া শত হস্ত দূরে চলিবে, সত্যের সন্ধান সে কখন পাইবে কিনা সন্দেহ। এই কথাটিকেই লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ বলিতেছে—

দেবজন্ম

অবিদ্যায় মৃত্যুং তীর্থ। বিদ্যায় অমৃতং অশ্বিনুতে।

শিখ্যার ধারে ধারে চলিতে হয়, কিন্তু অতি সন্তর্পণে, সজাগ হইয়া, দেখিয়া গুলিয়া, যাচাই বাছাই করিতে করিতে। তেমনভাবে চলিবার কৌশল যে আরম্ভ করিয়াছে, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সেই অমৃতত্ব লাভ করে; আর তেমন চাতুর্য্য যাহার নাই, সে অমৃতত্ব লাভ করে না, মৃত্যুই আগে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

এই উপলব্ধিই সহজিয়া সাধক কতভাবে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চণ্ডীদাস একবার বলিতেছেন—

সমুদ্রে পশিব নীরে না তিতিব

আবার বলিতেছেন :

কুলটা হইবে কুল না ছাড়িবে

অন্যত্র : হইবে গিন্ধী ব্যঞ্জন বাঁটিবি
না ছুঁইবি হাঁড়ি।

অথবা : সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিক রাজ।

কারণ, জীবন-সাধনার সমস্ত রহস্য হইতেছে এই :
বিষে অমৃতেতে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার

*

*

*

রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান

বিষ ছাড়ি' অমৃতেরে।

তান্ত্রিকেরা পঞ্চম'কারাদি অনুষ্ঠানের উপর এতখানি জোর কেন যে দিয়াছে তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অধ্যাত্ম সাধনার ভগবৎ সেবায় এই সকল উদ্ভট উৎকট জিনিষের আদৌ কেন অবতারণা হয় তাহা একটা বিষম প্রহেলিকা। সাধারণ বুদ্ধিতে ত বুঝি যোগ ও

অবিদ্যা মৃত্যুং তীক্ষ্ণং

ভোগ দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগৎ, একের সহিত অপরের কোন সংযোগ সাধনের চেষ্টা হইতেছে বান ভানিতে শিবের গীত। তাই এক শ্রেণীর লোকে তদ্রোক্ত এই সকল ব্যাপারকে একেবারে রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন—কিন্তু সব ছাড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া এমন ধারা রূপেরই বা কেন যে ব্যবহার হইল তাহারও ব্যাখ্যা দরকার। তাই আর এক শ্রেণীর লোকে বলেন তদ্রশান্ত্র হইতেছে আগাগোড়া লাম্পট্যের শিশ্নোদর-পরায়ণতার শাস্ত্র।

কিন্তু আসল কথা একটু অন্য রকমের। সৃষ্টির সমস্ত রহস্য এই। সেখানে বিষের মধ্যে সুখা লুকাইয়া আছে—সুখা যে চায়, তাহাকে বিষ হইতে দূরে থাকিলে চলিবে না, বিষই তাহাকে বরিয়া ছানিতে হইবে। বিষই সুখা, মূলতঃ তাহা কেবল একটা শোষণের উদ্ধৃঃপাতনের অপেক্ষা রাখে—হীরক যেমন হইতেছে পাথুরে কয়লারই উজ্জ্বল মুক্তি। কামেরই সার প্রেম—কাম হইতে প্রেমসার উদ্ধার করাই প্রেমের বা ভক্তির সাধনা। দেহের মধ্যে আত্মা জড়াইয়া গিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনুস্রুত ; আত্মাকে অতীন্দ্রিয়কে পাইতে হইলে দেহের ইন্দ্রিয়ের সাথেই বিশেষভাবে কারবার করিতে হইবে। পাকের মধ্যে মানুষের অন্তরাত্মা প্রোথিত—সেই অন্তরাত্মাকে উদ্ধার করিতে হইলে, তুলিয়া ধরিতে হইলে, পাকের মধ্যে নামিয়া যাইতে হইবে—পাক গায়ে না লাগে, সে কথা আলাদা—কিন্তু নামিতে ত হইবে, তাহাকে বাদ দিয়া, তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া চলিবে না। অবশ্য সেরকম ঐকান্তিক সন্যাসের পথ অনেকে অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু মনে হয় উপনিষদ তাহাদিগকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যাঃ রতাঃ।

সাধন ভজনের স্থান মন্দিরের গায়ে অশ্লীলতার জন্য আসন এত সঙ্গত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে কেন ? বিদ্যার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া অবিদ্যা

দেবজন্ম

স্পষ্ট ত এই ঘোষণাই করিতেছে—আমাকে ধরিয়া ধরিয়া চল মৃত্যুর
ওপারে—

অবিদ্যার মৃত্যুঃ তীর্থ।।

ধর্মের, অধ্যাত্মের বিশেষ সাধনার কথা ছাড়িয়া, আমরা যদি তাহার
সাধারণ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ মূল আদর্শটি বিচার করিতে বসি তবে সেখানেও
পাইব ঐ একই তত্ত্বের উদাহরণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আলোকের
যুগে ধর্ম বা অধ্যাত্ম বস্তুটিকে আমরা অবস্থা বিশেষে কখন তাচ্ছিল্যের
কখন ঘৃণার কখন বা আশঙ্কার চোখে দেখি—বলি ও-বস্তুটা হইতেছে
মহাযুগের নিছক অপরিপক্ব ননের কুসংস্কার। অবশ্য যখন পণ্ডি
Stake-এর, Inquisition-এর কথা, Massacre of St.
Bertholemy-র কথা, যখন ভাবি একটা সহজ সামান্য সত্য
স্থাপন করিতে গিয়া গালিলেও ধর্মের হাতে কি লাঞ্ছনাই না ভোগ
করিয়া গিয়াছেন—অত দূর অতীতেই বা বাইতে হইবে কেন, যখন
শুনি আধুনিকতম আমেরিকায় পর্য্যন্ত ধর্ম বিবর্ত-বাদের সহজ সত্যটিকে
গলা টিপিয়া মারিতে চাহিতেছে, আর নিজের ঘরে চোখের উপরেই
যখন দেখিতেছি ধর্মের নামে হিন্দু-মুসলমান কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া কি
বীভৎস পশুত্বকে বরণ করিয়া লইতে চলিয়াছে, যেন ডাক ছাড়িয়া বলিতে
ইচ্ছা হয় নাকি—ধর্ম ঠাকুর আপনি মাথায় থাকুন, কিছুকালের জন্য
গরীব মানুষকে রেহাই দিন—আমরা হইতে চাই নাস্তিক, পাষণ্ড ?
কেমাল পাশা খলিফাকে কি সাধে কুপোকাৎ করিয়াছেন ? সাম্প্রিক
আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ চোখে আঙ্গুল দিয়া যে সত্য দেখাইতেছে, অন্ধ
না হইলে তাহার সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উঠিতে পারে না।

তাই কি ? ধর্মের ব্যভিচার চিরকাল আছে, ধর্মের নামে অধর্ম
আচরণ নিত্যই হয় বলিয়া ধর্ম জিনিষটা যে নাই বা বাস্তবিকও
দুর্জনের মতই পরিহর্ষব্য, এমন কথা ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ করে না।

অধর্মের ভয়ে ধর্মকে যদি নিব্বাসন দেই, তবে অধর্মের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি, কিন্তু পড়িবি গিয়া বিধর্মের কবলে। ধর্মকে অধ্যাত্মকে বাদ দিয়া জীবন যাত্রা যে সম্ভব নয় তাহা নয়, ধর্ম ছাড়া অধ্যাত্ম ছাড়া আরও আদর্শ অবশ্যই আছে—কিন্তু সে সকলেরই আমি নাম দিতেছি ‘বিধর্ম’, কারণ তাহাতে মানুষের পূর্ণ অভিব্যক্তি, অর্থও সার্থকতা হয় না, সে সকল হইতেছে ‘অল্লেপর’ সাধনা। মানুষের স্ব-ধর্ম হইতেছে ধর্মের অধ্যাত্মে। আদর্শ যত বৃহৎ তাহার সাধনায় বাধাও তত বিপুল—লক্ষ্য যত উচ্চ পতনের সম্ভাবনাও তত নীচে। জিনিষ যত স্পন্দর তাহারই বিকার হয় তত কুৎসিত। তবুও ত ভূমিব স্মৃৎ। প্রত্যেক বিকার, প্রত্যেক বাধা, প্রত্যেক পদস্থলন আদর্শের স্বরূপকে আরও স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন সুপ্রকাশ করিয়াই কি ধরিতেছে না? ব্যভিচার হইতে সত্যকার সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার দরুণ ভর পাইয়া সে পশ্চাৎপদ হয় না। অবিদ্যার মৃত্যু তীর্থ ১।...

ধর্মঠাকুরের সাথে সাথে মনে পড়ে ত্রিশরণের আর দুটি শরণ—সম্ম ও বুদ্ধ মঠ, “মনাষ্টারী” (monastery) পরিণামে যে কি ধরণের জিনিষ হইয়া পড়ে তাহার জনস্ত সাক্ষ্য দিতেছে ইতিহাস, —আমাদের দেশের হোক আর ইউরোপের হোক। সে সাক্ষ্য ঠিক একই, আর তাহাতে গোল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কথা সত্য, সম্ম অনেক দোষ ক্রটির আকর হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সেই জন্য সম্ম জিনিষটাই সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে, কোথাও কোন-রূপে তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, এমন কথা হইতেছে অতিশয়োক্তি। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ জিনিষটি যে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে, এই নিরন্তর চেষ্টাই যথেষ্ট প্রমাণ যে সম্ম জিনিষটির ভিত্তি মানুষের একটা গভীরতম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আসল কথা, আদর্শ যদি না গড়িয়া উঠিয়া থাকে তবে তাহার কারণ ইহা নহে সম্ম

দেবজ্ঞান

আদর্শটাই তুল, কারণ হইতেছে এই, যে রকম অবস্থায় আদর্শ সজ্জ স্থাপিত হয়, সেই অবস্থা আমরা আনিতে পারি নাই, যে সব সর্বের উপর দাঁড়াইলে তাহা নির্দোষ সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া ওঠে সেই সর্ব আমরা পূরণ করিতে পারি নাই। তেমন সর্ব কোন দিন পূরণ হইবে না, তেমন অবস্থা কোন দিন আনা যাইবে না একথা জোর করিয়া বলিবার কাহার অধিকার আছে? ত্রুটি কোথায়, অভাব কোথায়, তুল কোথায় হইয়াছিল, কি রকমে তাহা সারিয়া লইতে হইবে—অবিদ্যা দিতেছে এই জ্ঞান উপলব্ধি।

সজ্জের মনেই দেশে দেশে যুগে যুগে সাধক বুদ্ধেরও শরণ লইয়াছে—সে চাহিয়াছে গুরু, দিশারী, শরীরী ভগবান, পথ দেখাইয়া দিবার জন্য, বিপথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আপন শক্তি সামর্থ্য দান করিয়া সিদ্ধির দিকে চালাইয়া লইবার জন্য। এমন সত্যকার গুরু হয়ত কোটিকে গুটিক জোটে, তাই বলিয়া গুরুত্ব অসত্য হইয়া পড়ে না। ভগবান ও মানুষের মধ্যে মানুষী ভগবান বা ভাগবত মানুষ রূপ যে মধ্যস্থ অন্তরের সাধন জগতে তাহার কি রহস্যময় প্রয়োজন তাহা খৃষ্টীয় চার্চের পোপকে দেখিয়া হয়ত ননেও তুলিতে ইচ্ছা হয় না—কিন্তু তাহাতে সেই প্রয়োজনের অস্তিত্ব লোপ পায় না।

জগতের বীণায় দুটি তার—সরু ও মোটা, স্রষ্টার শ্রোতে দুইটি ধারা চলিয়াছে সমান্তরালে, একটি উপরে একটি নীচে, একটি ভিতরে একটি বাহিরে—দুই-এরই ভাব ভঙ্গী চলন বলন প্রায় একই ধরণের, উপনিষদের সেই “হা সপর্ণা সমুজ্জা সখায়া”র মত। উপরের তারে যে মুচ্ছনা বাজে নীচের তারেও তাহাই বাজে, উপরের ধারায় যে চেউ যে ভাবে চলিয়াছে নীচের ধারাতেও অনুরূপ চেউ ফুটিয়া উঠিয়াছে—তবে একটি কায়া আর একটি ছায়া, একটি শ্বনি আর একটি প্রতিশ্বনি, একটি প্রকৃতি আর একটি বিকৃতি। একটি হইতেছে

সত্যের স্তম্ভের মঙ্গলের আর একটি হইতেছে অসত্যের অস্তম্ভের অমঙ্গলের। বাহিরকার, মোটের উপরের একটা সাদৃশ্য দেখিয়া বিনি মনে করেন উভয়ে একই জিনিষ, কোন সত্যের স্তম্ভের মঙ্গলের আছে যে অসত্য অস্তম্ভের অমঙ্গলের একটি ছায়া তাহা দেখিয়া বিনি কায়া সম্বন্ধেও নাস্তিক শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়েন, তিনি অবিদ্যাকে ধরিয়া মৃত্যু পার হইবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—অমৃতত্ব লাভ ত তাঁহার পক্ষে দূরস্থান।

স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

মানুষ যেন নিজের পথে স্বাধীনভাবে চলে। পাছে পদস্থলন হয়, পাছে ভুল পথ ধরি, এই ভয়ে মানুষ যেন তাহার স্বাভাব্যকে তাহার স্বাচ্ছন্দ্যকে ক্ষুণ্ণ না করে। পরের হাত ধরিয়া ধরিয়া চলিলেও, কোথাও হেঁচট না খাইতে পারি, ঠিক পথেই বরাবর সনানে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার কোন লাভ কোন উপকার হইবে না, আমার কৃতিত্ব বলিয়া তাহাতে কিছু নাই। উঠিয়া পড়িয়া নিজের চেষ্টায় বতটুকু অগ্রসর হইতে পারি, ততটুকুই বাস্তবিক আমার অধিকার। তাহাই আমার সিদ্ধির প্রমাণ। ভুল করিবার সুযোগই বাহার নাই, সত্যকেও পাইবার অধিকার সে হারাইয়াছে। এমন যদি হয় যে ভুল করিয়া করিয়া কেবল ভুলই করিয়া চলি, সত্যের খোঁজ যদি না-ও পাই, যদি কেবল চেষ্টা করিয়া যাওরাই সার হয়, কল যদি কখনও না জোটে— তাহাতেও ক্ষতি নাই ; আর কিছু না হউক, নিজের নিজস্ব সম্বন্ধে আমি এই রকমে সজাগ হইয়া উঠি, আমি যে একটা কিছু এই চেতনা অন্ততঃ ক্রমশঃ আমার গাঢ় দৃঢ় হইয়া চলে। স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—বাহিরের দিক হইতে, লাভের সাফল্যের দিক হইতে দেখিলে আমাকে সকল রকমে রিক্ত বঞ্চিত দেখা যাইতে পারে, কিন্তু যে বস্তু আমি অধিগত করিয়াছি, বাহা আমার সিদ্ধি হইয়াছে তাহা আমার আমিষ বোধ, স্ব-এর চেতনা।

নিজের ধৰ্ম্ম খারাপভাবে অনুসরণ করাও ভাল, পরের ধৰ্ম্ম নির্ভুল ভাবে অনুসরণ করা অপেক্ষা। পরের ধৰ্ম্মে ফিটফাট সাহেব সাজা অপেক্ষা, নিজের ধৰ্ম্মে কৌপীনবস্ত্র হওয়া অনেকখানি শ্রেয়। কারণ

বাস্তবিকই একটা হইতেছে “সাজা” আর একটি “হওয়া” একটি সঙ্ঘ আর একটি স্বরূপ অর্থাৎ একটি নিখ্যা আর একটি সত্য।

এই যে সব কথা বলা হইল এবং যাহা আমরা আধুনিক যুগে একটু অতিরিক্ত জোর দিয়াই ঘোষণা করিয়া বেড়াই তাহা সত্য, খুবই সত্য—কিছু সন্দেহ করিবার নাই। কিন্তু আরও কথা হইতেছে এই যে, বহু সত্যের মত এই সত্যটিও পুরাপুরি সত্য নয়, সত্যের একটা খণ্ড দিক মাত্র। এমন দেশ কাল পাত্র আছে সেখানে ঠিক ইহার বিপরীত কথাটাই যেন আরও বেশী সত্য হইয়া উঠে, যখন বলিতে হয় পরের ধর্মের নিধনও ভাল, নিজের ধর্ম ভয়াবহ।

কি রকম? তবে ভিজ্জায়া করিতে হয়, মানুষকে যখন তাহার স্বধর্ম অনুসরণ করিতে বলি তখন স্বধর্ম অর্থে কি বুঝি, কোন বস্তু ঐ নামে নির্দেশ করিতে চাই? ব্যক্তি বিশেষের কোথায় ‘স্ব’, কি বা তাহার ধর্ম? অবশ্য বলা বাইতে পারে—“স্বধর্ম বাদী”র দলে যাহারা চুড়ান্ত বামগার্সী তাঁহারা এই কথাই বলিবেন—স্ব বা ধর্ম একটা স্বাপ্ন অধিকৃত নিত্য পদার্থ কিছু নয়, ওজিনিষটি তরল গচল বহুরূপী এমন কি অরূপ। মানুষ চলিয়াছে তাহার গোটা সভ্যটি লইয়া, ইচ্ছামত খেয়ালমত সে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা আহরণ করিতেছে—এই রকমে সে তাহার স্ব-কে, স্ব-এর ধর্মকে নিত্যই নূতন করিয়া গড়িতেছে, একটা নির্দিষ্টরূপ তাহার থাকিবে কি করিয়া? আসল কথা ভিতরের অনুভবে, চেতনায় মানুষ যদি অনুভব করে সে স্বাধীন, তাহার চেতনায় যদি থাকে এই উপলব্ধি যে নিজের পথে সে নিজে চলিয়াছে, তবে সেই পথটির নাম রূপ কি বা তাহার স্বাধীনতার বোধটি ঠিক কোন্ ধরণের তাহা বিচার করিতে বলা নিরর্থক।

কিন্তু তাহাই কি? জ্ঞানের কথা ত এ রকমের নয়। এ ত গেল অন্ধ পথিকের কথা—শ্রোতের তৃণ বা ছিন্নাশ্বের কথা। কারণ, জীবনকে

দেবজন্ম

যাহারা একটা আদর্শে সজ্ঞানে গড়িয়া তুলিতে চায়, তাহারা ত এই ভাবে প্রকৃতির চলে গা ছাড়িয়া দিয়া আপনাকে ভাসাইয়া দিতে পারে না। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, যথা-ইচ্ছার পথ বাস্তবিকই নিধনের পথ হইয়া উঠে, যদি তাহার পিছনে জ্ঞানের নির্দেশ না থাকে। কেবল চলিয়া গেলেই হয় না, চলা অর্থ যে অগ্রসর হওয়া এমন কোন নিয়ম নাই। চক্ষু না থাকিলে চলার আবেগে বিপথে ছুটিতে পারি, উপরের দিকে নয় নীচের দিকে, উন্নতি নয় অবনতির দিকেই নিঃশঙ্কচিত্তে চলিতে পারি।

কেবল চলার আনন্দই সব নয়—সৃষ্টির সমস্ত রহস্য মানুষের পূর্ণ সার্থকতা ঐ বস্তুটিতে আবদ্ধ নয়। প্রকৃতির মধ্যে যদি একটা বিবর্তন একটা ক্রমোন্নতির ধারা বহমান থাকে, তাহার মূল কেবল চলার আনন্দ নয়, সেখানে আছে চেতনার দৃষ্টি, একটা সজ্ঞান দিগ্-নির্গম, একটা স্থির লক্ষ্য, একটা সজাগ গ্রহণবর্জন। মানুষের ক্রমোন্নতির জন্য চাই চলার আবেগের সাথে জ্ঞানের নির্দেশ। ফলতঃ যদৃচ্ছা চলিতে চলিতে মানুষের অন্তরায় এক রকম প্রতিপদেই এমন সব সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িতেছে যেখানে যদি সে উন্নতি চায়, কল্যাণ চায়, চায় বৃহৎ প্রকাশ নিঃশ্রেয়স তবে তাহাকে জোর করিয়া বলিতে হয় নেতি নেতি, নিজের যদৃচ্ছার পায়ে শিকল দিতে হয়, স্বাধীনতাকে স্বাতন্ত্র্যকে সংযত খর্ব করিতে হয়।

কারণ, প্রাকৃত স্বভাবের মধ্যে থাকিয়া, যদৃচ্ছার পথে নিরঙ্কুশ চলিতে চলিতে মানুষ যে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য বা মুক্তি অনুভব করে তাহা বাস্তবিক হইতেছে প্রাকৃতশক্তির দাসত্ব। প্রাকৃত বৃত্তি যে পথে চালাইয়া লইয়াছে আমি সেই ভাবে চলিয়াছি—তাহাতেই আমার আনন্দ, তাই মনে হয় উহা আমার স্বৈচ্ছার পথ। প্রকৃতি আপনার কাজ সহজে আদায় করিয়া লইতে পারে, আপনার উদ্দেশ্য বিনা ক্রেশে সিদ্ধ করিয়া লইতে পারে—তাই ত এই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ, এই অলীক বা মায়িক

মুক্তির অনুভব মানুষকে দিচ্ছে। কিন্তু প্রাকৃত জীবনধারণ, গড়-লিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে একটু চলিবার চেষ্টা করিলেই বুঝি কতখানি আমরা হাত পা বাঁধা। ভাটিয়াল নোকা আপনার স্বচ্ছন্দগতি নইয়া গর্ব করিতে পারে, কিন্তু উজানের দিকে মুখ ফিরাইলেই বুঝিবে সে গর্ব তাহার কত মিথ্যা।

ফলতঃ মানুষ যতই আপনাকে স্বাধীন স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করুক না কেন, যত খুসী আপনাকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিক না কেন, স্বধর্মের দোহাই দিয়া যতই না সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে আসলে কিন্তু সে খুব বেশী দূর বাইতে পারে না। প্রাকৃত বৃত্তির একটা গভীর মধ্যে থাকিয়া কুপনগুকের মতই সে শুধু লক্ষ্যবাম্প করে। তাই যখন আমি হাঁক দিয়া বলি, আমি আমার স্বধর্মের পথে চলিয়াছি আনাকে নড়াইও না, তাহার অর্থ আমি একটা প্রবৃত্তির, অভ্যাসের, সংস্কারের কাছে দাসত্ব লিখিয়া দিয়াছি। আমি হিন্দু, স্মৃতরাং কালাপানি পার হওয়া আমার স্বধর্মে বাধে; আমি কুলীন, স্মৃতরাং দশটি বিবাহ করা আমার স্বধর্ম; আমি চোর স্মৃতরাং চিরকালই চুরি করিয়া আমার স্বধর্মকে অটুট রাখিব—স্বধর্মের নামে এই রকম দাবি অদ্ভুত হইলেও বিরল নহে।

এক হিসাবে দেখিলে দেখি, স্বধর্মের গণ্ডী কাটিয়া কাটিয়া পর-ধর্মকেই ক্রমাগত আত্মসাৎ করিতে করিতে জীব রূপান্তরিত হইয়া চলি-রাছে। স্বধর্ম হইতেছে একটা বিশেষ স্তরে দাঁড়াইয়া অধিকার করি-রাছি যে স্বভাব বা প্রকৃতি। কিন্তু সেই স্তরে ত থাকিয়া যাই নাই, সেখানে দাঁড়াইয়া উপরের স্তরের দিকে আবার হাত বাড়াইয়া দিয়াছি, যতক্ষণ সেই উপরের প্রকৃতি না অধিগত করিতেছি ততক্ষণ আমার পক্ষে তাহা পরধর্মই রহিয়া গিয়াছে, তবুও পরধর্ম বলিয়া তাহা অধি-কার করিতে বিরত হইতে পারি না। চেষ্টা অবশ্য পরের ধর্মকে

দেবজন্ম

পরের ধর্ম করিয়া রাখা নয়, তাহাকেও নিজের ধর্ম—স্বধর্ম করিয়া তোলা ; কিন্তু সে ত গেল পরের কথা, শেষ পরিণামের কথা—ইতিমধ্যে সাধনার অবস্থার পরের ধর্ম ত পরের ধর্মই রহিয়া যায়। এই রকম পরের ধর্ম যদি সম্পূর্ণ আত্মসাৎই না করিতে পারি, যদি কথঞ্চিৎ অনুসরণ বা অনুকরণও করিতে পারি, তবুও তাহা অনেক সময়ে ত্রায়তে মহতো ভরাৎ। মানুষ আপন প্রকৃতিকে পরিবর্তন করিয়াই উন্নীত হইতেছে, অর্থাৎ আপন স্বধর্মকে অতিক্রম করিয়া চলাই মানুষের উন্নতি। এই উন্নতির ধাপ বত উঁচু হয়, স্বধর্মের বিপর্যয়াও হয় তত বিপুল।

অবশ্য বলা যাইতে পারে, এই যে স্বধর্মের পরিবর্তন ইহার কোথাও একটা কিছু সীমা নিশ্চয়ই আছে। হাজার পরিবর্তন বিপর্যয়ের মধ্যেও বিশেষ ব্যক্তির প্রকৃতিতে একটা বিশেষত্ব, একটা হাব বা ভাব বা ছন্দ বরাবর সমান থাকিয়া যায়, সকল প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা মূল সুর বা সূত্র স্থির নির্দিষ্ট থাকে—এই রকম একটা সীমা না থাকিলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা ব্যাঙ্গিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু তত্ত্ব হিসাবে একথা সত্য হইলেও, ব্যবহারে সঠিক সীমাটি আবিষ্কার করা স্নকটিন। সে-চেষ্টা করিতে গেলে স্বধর্মেরই নত ব্যক্তিত্বকেও একটা গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিব, জীব পুরুষকে খাট করিয়া পঙ্গু করিয়া ধরিব।

আসল কথা, ব্যক্তির যে ‘স্ব’ বা নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব তাহা তাহার মধ্যে ‘ব্রহ্ম’ হইতে ‘অনু’ পর্য্যন্ত প্রসারিত ; তাহার চেতনা বা পুরুষের স্থিতি যে স্তরে তদনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার স্বরূপ ও স্বধর্ম। সুতরাং স্বরূপ ও স্বধর্ম আপেক্ষিক সত্য মাত্র, তাহা যাবচচন্দ্র-দিবাকরৌ কিছু নয়। চেতনার উদ্ধৃগতি হিসাবে স্বধর্মের ধর্মাস্তর আর স্বরূপের রূপাস্তর প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, আর তাহা না ঘটিলে বুঝিতে হইবে চেতনার প্রগতি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, হয়ত নিম্নগতি শুরু হইয়াছে।

তবে চেতনার এই উদ্ধৃতি ও অধঃগতি ছাড়া একটা তির্য্যকগতি আছে।
এই তির্য্যকগতির ক্ষেত্রেই স্বধর্মের একটা দ্বির গণ্ডীর প্রয়োজন—
এইখানেই গীতার উপদেশ সত্য ও নান্য। সে কথা বারাস্তরে
আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

শ্রীঅরবিন্দ যখন বলিয়াছিলেন—“আনাদের যোগ আমাদের জন্য নহে, মানবজাতির জন্য,” তখন অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে এই মহাপুরুষটিকে, বাহা হোক, পৃথিবী একেবারে হারায় নাই ; ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে সন্যাসীগণের জন্ম দিয়া আসিতেছে—সম্ভবতঃ ভারতের নিজে, মানবজাতির, (অথবা এমন কি তাঁহাদের নিজেদেরও) বিশেষ কোন লাভ তাহাতে হয় নাই—তাঁহাদের দীর্ঘ তালিকায় সংযোজিত হইবার আর একটি নাম তাঁহার নহে। লোকে মনে করিয়াছিল যে তাঁহার যোগ মানবজাতির সেবার উৎসর্গীকৃত আধুনিক এক সাধনপন্থা। মানবজাতির সেবা তাঁহার আধ্যাত্মিকতার মর্শ্বকথা না হইলেও অন্ততঃপক্ষে উহা তাহার সফল পরিণাম ও পরিপুষ্টি। তাঁহার যোগ যেন একপ্রকার সুকুমার শিল্পসাধনা বাহা অদৃশ্য কতকগুলি শক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগের দ্বারা অধিকতর সার্থকভাবে মানব জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ—কেবল যুক্তিপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বাহা সাধ্যায়ত্ত নহে।

শ্রীঅরবিন্দ দেখিলেন যে তাঁহার উক্তির এই সাধারণ ব্যাখ্যা দ্বারা লোকে তাঁহার শিক্ষার মূল সত্যটি হইতেই বিচ্যুত হইতেছে। সুতরাং তিনি তাঁহার কথাগুলি পরিবর্তিত করিয়া বলিলেন—“আনাদের যোগ মানবজাতির জন্য নহে, ভগবানেরই জন্য।” কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই যে দিক-পরিবর্তন ইহা অনেকস্থলে সাদরে গৃহীত হয় নাই ; কারণ উহাতে তাঁহাকে দেশের বা বিশ্বের কাজের জন্য ফিরিয়া পাইবার সমস্ত আশা তিরোহিত হয় এবং লোকে আবার তাঁহাকে স্বপ্নালু

দার্শনিক—জাগতিক ব্যাপারসমূহ হইতে স্বদূরে অবস্থিত অক্ষর ব্রহ্মেরই নত বলিয়া মনে করিতে থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ যে আদর্শের জন্য যত্ন করিতেছেন তাহার স্পষ্টতর একটা ধারণার জন্য, তিনি আমাদেরকে যে দুইটি সত্ত্ব দিয়াছেন ঐ দুইটি সন্মিলিত করিয়া লইয়া বলিতে পারি তাঁহার উদ্দেশ্য মানব জাতির মধ্যে ভগবানের উপলব্ধি ও প্রকাশ। মানবজাতির সেবা তিনি এই হিসাবেই করিতে চাহেন অর্থাৎ মানব জাতির ভিতর তিনি ভগবানকে প্রকট ও শরীরী করিয়া তুলিতে চাহেন। তাঁহার লক্ষ্য বৃহত্তর ঋদ্ধি নাত্র নহে; পরন্তু একটা পরিপূর্ণ পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধন—মানব জাতির ভাগবতায়ন।

এখানেও কতকগুলি সম্ভাব্য ভুল ধারণার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে। মানব জীবনের রূপান্তর বলিতে ইহাই বুঝাইতেছে না যে সমগ্র মানবজাতিই দেবজাতিতে পরিণত হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ হইতেছে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতর একটা মানবগোষ্ঠীর বিবর্তন বা আবির্ভাব ঘটিবে—যেমন মানুষ ক্রমবিকাশের পথে পশুস্তরের স্তর হইতে উন্নততর একটা জীবের স্তরে উঠিয়া গিয়াছে, এমন নয় যে সমস্ত পশুজাতিই মানবজাতিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ একটা পূর্ণ পরিণতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন ইহা যে কেবলমাত্র সম্ভব তাহা নহে, ইহা অনিবার্য। মনে রাখিতে হইবে যে, যে শক্তি এই পরিণতি আনিয়া দিবে এবং যাহা ইতিপূর্বেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে উহা কোন ব্যক্তিগত মানবীয় শক্তি নহে—তাহা যত বড়ই হোক না কেন—কিন্তু ভগবান স্বয়ং; ভগবানের আপন শক্তি এই পূর্ব-নির্দিষ্ট পরম পরিণতির জন্য ক্রিয়াপর হইয়াছেন।

এইখানেই রহস্যের মর্ম—সমস্যার সম্মান নিহিত আছে। অতি-মানব বা দেবজাতির অভ্যুদয় যতই বিস্ময়জনক ও অসম্ভব ব্যাপার

দেবজন্ম

বলিয়া প্রতীয়মান হোক না কেন উহা বস্তুতঃ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার যথার্থ কারণই হইল এই যে, কোন মানবীয় প্রতিনিধি নয়, ভগবান স্বয়ং তাহার পরম সামর্থ্য, জ্ঞান ও প্রেমে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ মানবপ্রকৃতির মধ্যে ভগবানের অবতরণ এবং তাহার বিস্তৃতি ও রূপান্তর সাধনপূর্ব্বক সেখানেই অবস্থান ইহাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের সাধনার সম্যক তথ্য। সাধককে হইতে হয় শুধু প্রশান্ত ও আত্মস্থ, ধীর আত্মসমর্পণ ও উন্মুক্ত, সন্নতিশীল ও গ্রহণক্ষম। তাহার নিজের কোনও কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, করা উচিতও নয়, তাহার বাবতীয় কর্তব্যের ভার ঐশী গুরু ও পথপ্রদর্শকের উপরই ন্যস্ত করিতে হয়। অতীতে অন্য সব যোগপন্থা বা অধ্যায় অনুশীলন চেতনার উদ্বেগ আরোহণ, ভাগবত চেতনার তাহার উদ্গতি এবং পরিশেষে উহার মধ্যে তাহাকে মিলাইয়া, বিলোপ করিয়া দেওয়ার উপরই বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিল। কর্তৃমুখী ও ব্যবহারিক মানুষী প্রকৃতিকে ভগবানের সুস্পষ্ট আবাসস্থানরূপে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য ভাগবত চেতনার অবতরণের কথা পূর্ব্বে আলোচিত যদি হইয়াও বা থাকে, অতীতের সাধনা ও সিদ্ধির উহা প্রধান বিষয় ছিল না। অধিকন্তু এখানে যে অবতরণের কথা বলা হইতেছে তাহা ভগবানের চেতনা-বিশেষের অবতরণ নহে—কেননা, ভাগবত চেতনার বহু স্তর-ভেদ আছে—তাহা হইতেছে সত্যাত্মক-শক্তি-বিশ্বত ভগবানের আপন চেতনার অবতরণ; কেননা উহাই প্রত্যক্ষভাবে এই যুগের যে বিবর্তনশীল রূপান্তর তাহা সংসিদ্ধ করিয়া চলিয়াছে।

অবতরণের প্রকৃত অর্থ কি, কিরূপে তাহা ঘটে, তাহার কাজের দ্বারা সব কেমন, কি কি ফল আনিয়া দেয়, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে। আনি শুধু বলিব অবতরণের সাধারণ কথাটি—অবতরণ প্রকৃতই অবতরণ। ভাগবত আলো প্রথমতঃ

মনে নানিয়া আসিয়া সেখানে শুদ্ধির কাজ আরম্ভ করে—বদিও অন্তঃ-হৃদয়ই (inner heart) প্রথমে ভাগবত স্পর্শকে চিনিয়া লয় এবং ভাগবত কার্যে তাহার সম্মতি দান করে—কারণ মন অর্থাৎ উর্দ্ধতর মনই (higher mind) হইল সাধারণ মানব-চেতনার শীর্ষভূমি এবং উপর হইতে যে দিব্য জ্যোতিঃপ্রবাহ সব নানিয়া আসে উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সহজে ও সস্তর গ্রহণ করিতে পারে। মন হইতে সেই আলো আবেগ ও বাসনার স্থূলতর ক্ষেত্রসমূহে, জীবনে ও কর্মে, কর্মমুখী প্রাণে, সর্বশেষে পাশব জড়ের মধ্যে, কঠিন তিনিরাচ্ছন্ন নিরেট স্থূল শরীরে প্রবেশ করে, কারণ উহাকেও আলোকিত, সেই পরা জ্যোতির রূপায়ন ও মুক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। অবতরণমুখী কল্পনার আধার ভগবান সেই দিব্যস্থপতি—যিনি ধীরে অব্যর্থভাবে মানবপ্রকৃতি ও মানবজীবনরূপ এই বহুপ্রকোষ্ঠময় ও বহুতলবিশিষ্ট ইমারতখানি ভাগবত সত্যের পরিপূর্ণ লীলা ও ছন্দে গড়িয়া তুলিতেছেন। কিন্তু, বিষয়টি গুঢ় ও জটিল—ইহার অন্তরঙ্গ আলোচনা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন সাধক বোণ রহস্যের মধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হইরাছে ও নবদীক্ষিতের পক্ষে প্রাথমিক অপরিহার্য বিষয়গুলি আরম্ভ করিয়াছে।

অন্য একটি প্রশ্ন যাহা সাধারণ মানুষের মনকে পীড়িত ও বিব্রল করিয়া তোলে তাহা হইতেছে কাজটি সম্পন্ন হইতে কত কাল লাগিবে—ইহজন্মে, না, এখন হইতে সহস্র বৎসর পরে অথবা উপমাশ্বরূপ যেমন কেহ বলিয়াছেন—সুদূর ভবিষ্যতে, কোনও জ্যোতিষিক মাপের পরে—যখন সূর্য্য শীতল হইয়া যাইবে, তখন? কাজের গুরুত্বের তুলনায় এই কথা বলিলে যুক্তিসঙ্গতই হইবে যে আমাদের সম্মুখে সমগ্র অনন্তকাল পড়িয়া রহিয়াছে এবং শতাব্দী এমন কি সহস্র বৎসরও যদি এইরূপ কাজে প্রয়োজন হয় তবে তাহাতেও কুষ্ঠিত হইবার কিছু নাই; কেননা অতীতের অগণিত সহস্র সহস্র বৎসরের বিপর্যয়সাধন এবং সুদূর-

দেবজন্ম

প্রসারী ভবিষ্যতের পুনর্গঠন ভিন্ন এ কার্য আর কিছুই নহে। বাহ্যিক হোক, আমরা যেমন বলিরাছি—যেহেতু ইহা ভগবানের আপন কাজ এবং যেহেতু যোগের অর্থ কাজের একটা সংক্ষিপ্ত (concentrated) ও অন্তর্লীন (involved) ধারা বাহ্যিক, স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধ হইতে গেলে হয়তো বহুযুগ লাগিত, এমন কাজ মুহূর্তে সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে, সেই কারণে বলিষ্মে নয়, যথাসম্ভব শীঘ্রই এই কাজ সংসিদ্ধ হইবে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক আদর্শ হইতেছে “এখন এবং এইখানেই”—এইখানে এই পৃথিবীতে, পাণ্ডিত্য অবস্থানের মধ্যে এবং বর্তমানে ইহজীবনে, এই শরীরেই—পরকালে বা অন্যত্র নয়। সেই কাল কত দীর্ঘ তাহা অনেক কিছু উপর নির্ভর করে, কিন্তু দু’এক যুগ কম বা বেশী হলে কিছু এসে যায় না।

এই দিব্য সংসিদ্ধির ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আবার বলি যে একথাটি আসল বিচার্য বিষয় নয়, পরিমাণ নয় সার পদার্থ লইয়াই কথা। যদিচ ইহা ক্ষুদ্র একটা কেন্দ্রই (nucleus) বা হয় তবে তাহাই যথেষ্ট—অন্ততঃ প্রারম্ভের পক্ষে—অবশ্য যদি তাহা প্রকৃত ও খাঁটি জিনিষ হয়—স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এ সকলের প্রমাণ কি—লোকে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে কিনা, কপোল কল্পনাকে অনুসরণ করিতেছে কিনা, তাহা বুঝা যাইবে কিরূপে? আমরা বাইবেলের ভাষায় বলিতে পারি যে, খাদ্যের প্রমাণ নির্ভর করে খাওয়ারই উপর।

উপসংহারে, স্পষ্টতঃ স্ক্রুয়ার শিল্পের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থে এই কথা কয়টি অন্তর্ভুক্ত করিবার সপক্ষে একটি কথা আমার বলিবার আছে। কারণ আধ্যাত্মিকতাকে অন্যতম চারু বিদ্যা (art) হিসাবে কি করিয়া গণ্য করা যায় অথবা এই রাজ্যে সম্মানজনক একটা স্থান কি করিয়া তাহাকে দেওয়া চলে? এক দিক হইতে দেখিতে গেলে

মূল ও আভ্যন্তরীণ সত্যগুলির দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে আধ্যাত্মিকতা যাবতীয় চারুবিদ্যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও তাহাদের ভিত্তিস্বরূপ বটে। সুকুমার শিল্পের যদি উদ্দেশ্য হয় বস্তুর অন্তরাত্মাকে প্রকাশিত করিয়া ধরা এবং যেহেতু বস্তুরাজির সত্য অন্তরাত্মা তাহাদের ভাগবত সত্তা, তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে, সজ্ঞান সংস্পর্শে আসিবার যে অনুশীলন, তাহাকে সুকুমার শিল্পের রাজ্যে রাজ্যোচিত আসন দিতে হয়। তদ্ব্যতীত, এক হিসাবে আধ্যাত্মিকতা সমুদয় সুকুমার শিল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠই এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন—কেননা ইহা জীবন-শিল্প। জীবনকে সৌন্দর্য্যে অনবদ্য, ছন্দে নির্দোষ, শক্তিতে পরিপ্লুত, জ্যোতিতে ভাস্বর, আনন্দে স্পন্দিত—এক কথায় ভাগবত বিগ্রহ করিয়া গড়িয়া তোলাই হইতেছে আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ আদর্শ। এই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে আধ্যাত্মিকতা—যে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন শ্রীঅরবিন্দ করিতেছেন তাহা—শিল্পের পরম পরাকাষ্ঠা।*

* এই প্রবন্ধটি “The Four Arts Annual” নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রথমে ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছিল।

311/49/1100



मूल्य २५०